পদ্ম দীঘির বেদেনী

অমরেন্দ্র ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত

দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬২

প্রচ্ছদপটশিল্পী :

ব্রাইট্ স্পট্

ব্লক :

ভারতবর্ষ হাফটোন ওআর্কস্,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

দাম :

তিন টাকা

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

পদ্মদীঘির বেদেনী

একটা বিস্ময়ের রাজ্য এই জমিদার বাড়িটা।

বাড়ির দরজায় একটা বিরাট দীঘি। কতকালের প্রাচীন তা গ্রাম্য সাধারণ জানে না। শুধু এইটুকু তারা জানে যে বাদশার আমলে যখন সঞ্জয় না সঞ্জীব শর্মা প্রথম এই পরগনাটা পত্তন নিয়ে, ঢোলসহরৎ করে এসে দখল করে বসলেন এই গাঁয়ে, তখন তাঁর তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়ই নাকি এই দীঘি হয় খোঁড়া।

খেয়ালী মহিলা নাকি বলেছিলেন : শীতের ভোরে শিশির-ভেজা মাঠে তিনি আল্‌তা-পরা পায়ে যতদূর হেঁটে যেতে পারবেন—ততদূর পর্যন্ত হবে দীঘির সীমানা। নগ্ন পায়ে তিনি সাধ মিটিয়ে হেঁটেও ছিলেন বটে, নইলে কি হয় এত বড় দীঘি!

তাঁরই ইচ্ছায় যেন কোন পাহাড়ের বুক কেটে আনা হয়েছিল শুভ্র মসৃণ শ্বেত পাথর—পূব দীঘলি ঘাটলা হ'ল তাই দিয়ে। এলো রাঙা পাথর, উঠল নহবৎখানা। কত 'বৌছত্তর', কত রক্তপদ্ম যে আঁকা হ'ল কুশলী শিল্পী দিয়ে! আজ ইচ্ছাময়ী নেই কিন্তু তাঁর ইচ্ছাটি যেন এখনও জড়িয়ে রয়েছে এই পদ্ম-দীঘির চার পারে। যারা দেখে তারাই কেমন যেন একটা ব্যথা বোধ করে। দীঘির পারে-পারে কত যে কেয়া কাঁটার জমকাল ঝাড় হয়েছে—কত কি জটিল শিকড়ে-বাকড়ে জড়িয়ে ধরেছে এমন শ্বেতপাথরের ঘাটলাখানা! ঢেঁকির লতা ঠেলে উঠেছে নহবৎখানার চূড়ায়। বট-অশ্বত্থ জন্মেছে এখানে-ওখানে

সতেজে। ঘাটলার কতক অংশ কখন যেন ধ্বসে গেছে ভূমিকম্পে সেবার, সেই কোন সনে যেন। দীঘির পশ্চিম পারে জেগেছে একটা সাত-আঠ বিঘা চর। উত্তর পারে শেওলা দাম ও কচুরী পানা হেজে মজে পচে জন্মেছে এমন একটা পুরু স্তর যে তার ওপর দিনের বেলা অক্লেশে এবং নির্ভয়ে এসে ওঠে গ্রামের গরু বাছুরগুলো। খায় হেউলী ঘাস, ঘন কলমীর দল। শেওলা ও পানিফল প্রচুর দেখা যায় জলের ওপর ভাসতে। মাঝে মাঝে রাঙা পদ্ম। তার আশপাশে কিলবিল করে চলে হলুদ কালো চক্কোরী-চক্কোরী মাছরাঙা সাপ। কুটিল চোখ আর লিক্‌লিকে জিভ দেখলে গায় কাঁটা দেয়।

পদ্মদীঘির চার পারেই অজস্র তালগাছ আকাশের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধে দিনের পর মাস, মাসের পর বছর, বছরের পর যেন শতাব্দী গুনছে। গুনতে গুনতে অনেকগুলো মহা প্রাচীন হয়েছে—তবু যেন নির্ভুল গাণিতজ্ঞের মত খাড়া হয়ে আছে। তাদের নির্মম রুক্ষতা স্থানে স্থানে মধুর মাধুর্যে ভরে দিয়েছে পাগলী জংলি লতাগুলো—শ্যামল উচ্ছ্বাসে, রঙিন পুষ্পার্ঘ্যে। মাঝে মাঝে আমলকী ও আমরুল গাছও জন্মেছে। যেন তারা পাতলা রোদে আমেজে দাঁড়িয়ে আছে। আর কান পেতে শুনছে ঘুঘুর ডাক, হরিয়ালের শিস, বুলবুলির মিঠে গলা।

আশপাশের কেয়া ঝাড়গুলো কী গহিন! তাদের বুকের তলায় কত পোকা-মাকড়ের যে চৌদ্দপুরুষের বাস! গোক্ষুর সাপ আছে জোড়ায় জোড়ায়। কাল কেউটে আছে ঐ কালীতলার ঢিপির ভিতরে—মাথায় তাদের পদ্ম, দাঁতে কুটিল বিষ। তারা গ্রীষ্মকালে চলে-ফেরে, শীতকালে ঘুমায়—এ কথা তমালতলার সকলেই জানে। তাই হুঁশিয়ার হয়ে, সময় বুঝে, সমঝে সমঝে পদ্মদীঘির পার দিয়ে হাঁটাচলা করে সবাই।

গাঁয়ের লোকে এখনও নিশুতি রাতে, কি নিঝুম দুপুরে ইচ্ছাময়ীর আলতা-পরা লঘু পদধ্বনি শুনতে পায় কান পেতে থাকলে। মানুষ মরে, কিন্তু মায়া তো তার যায় না। সে অশরীরী আত্মা হয়ে ঘোরে। তাই বৌ-ঝিরা যখন তখন পদ্মদীঘির জল আনতে যেতে ভয় পায়।

কিন্তু ভয় নেই ময়নার!

সে বেদেনী। এই পদ্মদীঘির এক কোনেই তার বাসা। আটটা শক্ত খুঁটির ওপর বাঁশের আধ ফালি শ খানেক চেরা পেতে তার স্বামী বেঁধে দিয়ে গেছে ঘর। ছেয়ে দিয়ে গেছে ছনের চাল। বুনে দিয়ে গেছে বাঁশ চিরে পাতলা বেড়া। কত বাছ-বিচার করে ঢেঁকির লতা, জংলা পাতা যে ব্যবহার করেছে বুনো ঘরামী তা দেখে ময়না অবাক হয়ে যায়! এক একটা নিপুন বাঁধন না যেন ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িয়ে রেখে গেছে সারা ঘরে।

জংলী যাযাবর নীড় বেঁধেছিল পাগলী ময়নাকে নিয়ে মৌসুমী পাখীর মত এই পদ্মদীঘির এক কোণে। তখন ময়নার কি বা বয়স—পাগলা মতি, পাগলা চলন, বড় ভাল লাগত খিলখিল করে হাসতে।

চেয়ে চেয়ে দেখত তার স্বামী আর সময় সময় বলত, সব পাগলামী তার নাকি চুরমার হয়ে যাবে একটি ছাওয়াল হলে।

ময়নার লজ্জা হ'ত—সে চোখ রাঙাত তার বুনো স্বামীকে।

পাখ-পাখালিতে বাসা বাঁধে, হামরা মুনিষ্যি কি আশা করব না মোটে? হামরা চৌদ্দ-পুরুষ বেদে, এই বিলটে রেকোড হলো বাবার নামে, তাই তো এলাম তোকে সঙ্গে করে নিয়ে এইখানটিতে। সাধ আছে ময়না, তোর একটা ছানা হক, দানাপানি দিয়ে মানুষ করি হামি। বাপের নাম রাখবে, সেও বাসা বেঁধে লিবে তোর পাশটিতে--তারপর তার ছাওয়াল। পদ্মপাতার মত বাসা সব সারি নাগান। কেমনটি দেখতে হবে ময়না? আমাদের বাপধনদের বাসা? আর তারা এদেশ ওদেশ ঘুরবেক না· নাও-লগি ঠেলবেক না। পদ্মদীঘি এককালে হবে বেদের দীঘি। তোর পেটের ছাওয়াল নাতিপুতির বিল লো ময়না।

তখন ময়না এ কথার আস্বাদ পায় নি, এ আশার মর্ম বোঝে নি।

থাকত তারা নায়ে নায়ে, ঘুরত তারা দেশে দেশে, পাখীর মত শস্য কুড়াত এখানে ওখানে। কোনও সঞ্চয় ছিল না, সার্থকতা ছিল না, প্রতিষ্ঠা ছিল না

কোনও দেশে। মানুষের পরিচয় যে তার ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে নিয়ে, বন্য যাযাবরী জীবনের চেয়েও যে একটা সুসভ্য কাম্য জীবন মানুষের আছে, আছে তার বংশ-পরিচয় ধরিত্রীর একটি বিশিষ্ট অংশকে জড়িয়ে, তারই স্বপ্ন দেখেছিল প্রথম তার বুনো স্বামী। সব কিছু সে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারেনি ময়নাকে, কিন্তু গাঢ় ছাপ ফেলে গেছে তার মনে। রেখে গেছে উদ্দাম বাসনা—বেদিয়া মনের উগ্র কামনা, নীল অগ্নিশিখার মত সুতীক্ষ্ণ শাণিত।

ময়নার গর্ভে সে জন্ম দিয়ে যেতে পারেনি তার কামনাকে।

অকালে সে কাল কেউটের ঘায় প্রাণ দিয়েছে এই পদ্মদীঘির দল ঠেলতে গিয়ে। বেদেনী ময়না জড়ি-বুটি ঝাড়-ফুঁক কত কি করল। কত ওঝা-বদ্যি সে খবর দিয়ে আনল তার সমাজের, তবু নীল হয়ে গেল তার স্বামী কাল-নাগিনীর বিষে। ময়না কত চুষে চুষেও বিষ নামাতে পারল না। মুসলমানের মেয়ে হয়ে সে মা-মনসার মানত মানল, তবু ফাঁকি দিয়ে গেল বুনো বেদে।

তার দেহ সে সাত দিন সাত রাত জলে ভাসিয়ে রাখল। তারপর মাটি দিল পদ্মদীঘির পারে।

সেই থেকে সে একা···

শুধু সঙ্গী তার স্বামীর ঘরখানা ; স্বামীর রেখে যাওয়া একখানা পরচা আর নক্সা একখানা এই পরগনার—যার ভিতর রয়েছে পদ্মদীঘির চৌহদ্দি একদাগে একলপ্তে। কোনও খণ্ড হয়নি, অংশ হয়নি—একবারে পূর্ণ দীঘিটার মালিক এই বিধবা বেদে-বৌ।

কেমন করে যে ময়নার শ্বশুরের নামে রেকর্ড হয়েছিল, কি দলিলের বলে যে একটা সমান্য যাযাবর পেয়েছিল এই সুদীর্ঘ দীঘিটার মালিকানা স্বত্ব তার ইতিহাস ময়না জানত না। ও সব নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়সও তার তখন নয়। সে চঞ্চলা—সঞ্চারিত আবেগে বেতস লতার মত তার মন বেপথুমান।

কিন্তু আজ সে স্থির হয়েছে। ভাবতে শিখেছে : কে ভোগ করবে এই

বিরাট জলস্থল—কম পক্ষেও একশ কি দেড়শ বিঘা পার ও জলের পরিধি। কত আম, জাম, কুল, কাঁঠাল। কত শোল, বোয়াল, চিতল মাছ। কে খাবে, কে রক্ষা করে রাখবে? না হয় সে একটা জীবন পাহারাই দিল, কিন্তু তারপর? নানা কথা ভাবে ময়না আর বিড়ি টানে, কখনও বা তামাক।

[দুই]

কৃশাঙ্গী কালো ময়নার একটা রূপ ছিল। দ্যুতি ছিল গোল দুটো কালো চোখে। শুক্‌নো গালের মসৃণ আভায় একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ ছিল—যা দেখে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু টানতে থাকে মনের অগোচরে।

আসে ভৈরব, গেরুয়াধারী বৈষ্ণব—গান গায় বৈরাগ্যের।

ভাল লাগে ময়নার। সাধুকে বসতে দেয় যত্ন করে, প্রাণভরে খাওয়ায় পান-তামাক। চোখে তার জল আসে, বিবেকে আঘাত করে। কি হবে এসব বিত্ত-পসার রূপ-যৌবন দিয়ে? সকলি অসার। শুধু সার তাঁর নাম।

ময়না জানে যে সে মুসলমানের মেয়ে, স্বামীও তার ছিল মুসলমান। কিন্তু তেমন কোনও সমাজ নেই তাদের। গাঁয়ের সত্যিকারের মুসলমানেরা ঘৃণা করে। ওঠ-বসা খানাপিনা তাদের আলাদা। কোনো নামাজ পড়তে, রোজা করতে সে দেখেনি কারুকে, শোনেনি কোন ধর্মগ্রন্থের বাণী। তাই ময়নার ভাল লাগে নতুনও লাগে সাধুর গান, তার মধুর কথা।

রোজই আসে সাধু সকালে বিকালে।

তবে কি করব সাধু হামি? মনটি তো হামার পাগলা পাগলা করে হামেসা।

গান গাও, ভজন শেখো আমার কাছে।

দূর হ—হামরা না মোছলমান।

ভজনে দোষ নেই ময়না।

ক্যান্ বল তো গোঁসাই ?

ভৈরব বুঝিয়ে দেয় যে খোদা ও ভগবান এক। কোনও তফাৎ নেই এঁদের। কত মুসলমান হয়েছে বৈরাগী, কত বৈরাগী হয়েছে মুসলমান—শুধু ভিন্ন পথ, কিন্তু গন্তব্যস্থল এক। অতএব ভজনে দোষ কি? কি তফাৎ ভৈরব এবং বুনো বেদেতে? সে গান গেয়ে অর্থ বুঝিয়ে দেয় ময়নাকে।

ময়না কতদূর কি বোঝে ভৈরব বোঝে না। সে বিভোর হয়ে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে যায় তার জ্ঞানের সমুদ্র মন্থন করে। যেন এক একটি রত্ন তুলে দিচ্ছে রত্নাকর ভিখারিণী ময়নার হাতে।

আনন্দে ভৈরব কাঁদে—ময়না তন্ময় হয়ে থাকে।

এক একদিন হয়ত ময়না ছেলে মানুষের মত প্রশ্ন করে বসে, কাঁদিস ক্যান্ গোঁসাই ?

জগতের সব কিছু ত্যাগ করে মানুষ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর জন্য না কেঁদে উপায় কি ?

কার কথা বলিস হামি বুঝতে পারিক না। হামার তো কেউ নাই ছুনিয়ায়।

ভৈরবের রাগ হয় না। বিরক্তি বলতে তার মধ্যে কিছু নেই। সে আবার বৈরাগ্য ও নানা তত্ত্বকথা ময়নাকে শোনায়, বোঝায় আদি অন্ত অনেক কাহিনী। সৃষ্টিস্থিতি লয় প্রলয়ের কথাও তাকে বলে। অবশেষে বলে সকলি অসার, শুধু সার তাঁর নাম।

ময়না না বুঝলেও আবার বিভোর হয়ে যায়।

ছবি দেখেছ ময়না—প্রভুর পট ?

না, হামি কোথায় পাবেক ? কে দেবেক, কে আছে হামার ?

ভৈরব তার ঝুলির ভিতর থেকে সুন্দর একখানা ছবি বের করে, এই দেখ ময়না, প্রভু আমার দোলায় দুলছেন শ্রীরাধাকে নিয়ে।

সত্যই শ্রীকৃষ্ণ দোলায় দুলছেন। ঘন শ্যামল পুষ্পিত অরণ্যের মাঝখানে বাঁধা হয়েছে লতার দোলা। পাশে প্রেমময়ী শ্রীরাধা। লাবণ্যের প্লাবন এসেছে অরণ্যে। ধন্য করে দিয়েছে স্থাবর জংগম। রূপ পড়ছে যেন গলে গলে দোলার দোলে দোলে। নারী পুরুষে অপার বৈষম্য—কৃষ্ণ অংগ ও গৌর বরণে, কিন্তু কি মহা সাম্যতায় ছেয়ে গেছে বনস্থলী! ময়না চোখ ফিরাতে পারে না। সে ভৈরবের হাত থেকে ঝট করে টেনে নেয় পটখানা।

ভজন কর, বিলিয়ে দাও—দুলতে চাও যদি প্রেম দোলায়।

তুই কোথায় পেলি এ ছবি, হামি লিবেক, দিবেক না। বলে ছবিখানা ময়না বুকে লুকায়।

ভৈরব স্মিত মুখে বলে, ও তো সাধারণ পট, নেবে যদি নাও—হৃদয়ে রংয়ের তুলি বুলাতে হবে বেদে-বৌ, আর বসন চাই, গেরুয়া বাস। ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে সব অভিলাষ জগতের।...

ময়না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সবই ছাড়বে—স্বামীহীন সংসার অসারই তো বটে।

রাত্রে ময়না দেখে সে যেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে দোলায় দুলছে। সব সে ছেড়েছে এখন আর ভাবনা কি ? সে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন এমনি করে কাটিয়ে দেবে। তার কালো রূপ যেন ভাল লেগেছে দিব্য অংগ গৌর বর্ণ সাধুর কাছে। নইলে সাধুর চোখে অত রোশনাই কেন, কেন জল, কেন বলে ভজন শেখ, শান্তি পাবে ?

সে সাধুর দুরূহ কথা সব না-ইবা বুঝল তবু সে সকল সংশয় দূর করে ভজন করবে। পদ্মদীঘির বিরাট বিষয় ভোগ করে তার শান্তি নেই, বরঞ্চ ক্লান্তি এসেছে প্রতি অংগে।

কিন্তু গেরুয়া বাস যে চাই। চাই সাধুর মত বসন। নইলে মিল হবে না। সাধুর মুখ চোখের কি বিচিত্র গড়ন!

বেদিনী শুয়ে শুয়ে দেখে সুপুরুষ বৈরাগীর স্বপ্ন।

সব হলেও তো বেদে-বৌর গায়ের রঙ্ হবে না সাধুর মত। বেদিনী ঘষে মেজে রূপ ফোটাবে। হবে যত দূর হওয়া যায় প্রিয়দর্শন। তবু কি সাধুর মন পাবে না? যদি না পায় তবে কেন বৃথা ভজতে যাবে?

ময়না রেগে ওঠে। ক্ষোভে নুইয়ে পড়তে চায় না ওর জংলি মন।

ওর আবার মনে হয়, সাধুর নিশ্চয় ভাল লেগেছে ওর তীরের ফালার মত যৌবন। রঙ্ এখানে অবান্তর। ওর সাধু নিরীহ নির্দোষ।

কিন্তু নিরীহ বিহঙ্গকে তো শিকার করে আনন্দ নেই।

বেদিনী এগিয়ে আসে। সহানুভূতি এবং সোহাগে চঞ্চুপুট ঠেকায় সাধুর মুখে।

দূর! এসব সে কি ভাবছে?

ময়নার স্বপ্ন ভেঙে যায়।

গেরুয়া শাড়ি পেতে হলে নয়নকে পাওয়া চাই।

সকাল বেলা ময়না পদ্ম দীঘির পারের দিকে চেয়ে বসে থাকে। পারের ওপর দিয়ে পায়ে-চলা পথ। চারদিকের লোক ঐ পথ দিয়েই যাতায়াত করে হাটে বন্দরে এখানে ওখানে।

[তিন]

কে যাও গাঁ ? ওগো শুনে যা তাঁতির পো—এই ইদিকে। পদ্মদীঘির পার ভেঙে ময়না এগিয়ে যায়। তোর গাঁটরিতে কি ?

কাপড় নিয়া হাটে যামু—কোরা কাপড় ডোরা শাড়ি।

যাস্ ভাই তাঁতি—আয় না হামার বাঁসায়—তামাকু খেয়ে যা এক ছিলিম।

গাঁটরি মাথায় নয়ন ধীরে ধীরে নামে নিচের দিকে পদ্মদীঘির পায়ে-চলা পথ বেয়ে। উঁচু পাড়ের নিচে প্রায় জলের কাছে এসে কতখানি সমান্তরাল চওড়া জমি। বুক বোঝাই তার নরম ঘাস। ঘাসের শীষে অজস্র শাদা বেগুনি ফুল। জড়িয়ে ধরে ময়নার পায় পায়। নয়ন তা লক্ষ্য করে। বেশ লাগে দেখতে ময়নার শিশিরমাখা রূপার মল জোড়া—সাপটে পরা শাড়ির বেষ্টনটি। গাঁয়ের মেয়েরা কাপড় পরে, কিন্তু অমন আঁটসাট করে পরে না। অমন উঁচুতে তুলে খোপা বাঁধে না। যেন ফণা তুলে চলছে দর্পিতা এক সর্পিণী।

সর্পিণীই বটে ! নইলে কেমন করে একা একা পাহারা দেয় এত বড় মনুষ্যবিরল একটা দীঘি ? নয়ন কেন, গাঁয়ের সবাই তাই ভাবে। একটা বিস্ময় ও ভয় জড়িয়ে রহস্যময়ী হয়ে রয়েছে ময়না তমালতলার কাছে। ও অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জানে, জানে ভূতপ্রেত সাধনা। বাঘকে বশ করতে পারে এক নজরে—হরেক রকম গুণ-জ্ঞান জানে ওই বুনো বেদের বৌ।

নয়ন পিছে পিছে এসে থামে বাসার কাছে।

আয় গো তাঁতির পো, এই বাঁশের ধাপ বেয়ে—উঠে বস না বাঁসায়। আমি ছিপটি তুলে লিয়ে আসি। শোলটা বড্ড ঝটকাচ্ছে, ছিঁড়ে লিয়ে যাবে বাহারি বঁড়শিটে।

ময়না জীবন্ত মাছটাকে একটা বড় বাঁশের খাঁচায় পুরে জলে ফেলে রাখে। এমন ভাবে রাখে যে খাঁচার কিছুটা থাকে ওপরে, বাকিটা জলের তলে। এমনি না রাখলে নাকি মাছ বেশীক্ষণ বাঁচে না। শ্বাস নেবে কি করে?

ছিপটা রাখে ভাল করে জড়িয়ে চালের পাশে।...

নয়ন বলে, কি চাই তোমার? আমার হাটের বেলা যায়। যামু সয়নার চরে দু'কোশ পথ। কও কও শিগ্‌গীর।

আরে বস্‌ না মরদ—অত ব্যস্ত ক্যানে? দু'কোশ পথ আর তোর কাছটিতে কি?

তামাক আনে ময়না। বিড়ি তো লেই।

ওর দিকে চেয়ে থাকে নয়ন। খানিকক্ষণ হাটের কথা ভুলে যায়। ময়নাকে নয়ন অনেক দিন দেখেছে, কিন্তু কোনও দিন এমন মুখোমুখি দেখেনি। কালো মেয়ের এত রূপ? কিন্তু ভয় হয় চোখোচোখি চাইতে।

কি কাপড় চাই? ডোরা শাড়ি, জামরঙি না বাসন্তিবাহার?

নারে মরদা, ওই সব লিয়ে এখন হামি কি করবেক? চাই গেরুয়া শাড়ি।

গেরুয়া শাড়ি! ও তো আমরা বুনি না।

তবে? কোন্ খানটিতে পাব কিনতে তাঁতির পো?

নয়ন বলে যে থান ধুতি কিনে রঙ্ করে নিতে হবে। সে সব হাটে পাওয়া যায়।

তবে তুই লিয়ে আসবি এক জোড়া, আর গেরুয়া রঙ্।

হুঁ। নয়ন উঠে যায়।

ময়না একটা বাঁশের খুঁটির বুক চিরে রেখেছিল টাকা পয়সা। একটা বড় পর্বের মাথায় একটা ফুটো। তাই গলিয়ে ওরা জমিয়ে রাখে টাকা কড়ি। ওই ওদের বাক্স-পেটরা। তালা চাবির কারবার নেই ওদের।

সন্ধ্যা বেলায় যখন কাপড় নিয়ে ফেরে নয়ন, তার কাছে জিজ্ঞাসা করে দামটা চুকিয়ে দেয় ময়না। আর একটা তাজা বড় শোল মাছ দেয় ইনাম।

এইটা করো কি?

যা লিয়ে যা—খাবি রেঁধে।

দাম যে চাইর আনা!

আর তোর কামের দাম নেই বুঝি হামার কাছটিতে? কত মেহনৎ করে এনে দিলি বল তো!

নয়ন লজ্জা বোধ করে। কারণ তার মজুরী সে আগেই রেখেছিল গোপনে। এখন তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না পয়সা ক'গণ্ডা।

হায় রে লাজুক মরদ! এই, চোখ তোল। বলে ময়না তার চিবুক ধরে মুখখানা একটু তুলে ধরে। যা লিয়ে যা—সাঁঝ হয়েছে, যে সাপের ভয় পদ্মদীঘির পারে!

নয়ন সত্যই মরদ। শুধু মরদ নয়, যোয়ান। বলিষ্ঠ তার দেহ। তার শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাপের ভয়ে নয় সর্পিণীর স্পর্শে।

ষোল-সতেরো বছরের ছেলে। বিয়ে-থা করেনি। কোনদিন এমন করে কেউ বারবার তার পৌরুষকে সম্বোধন করেনি। তাই হাওয়ায় উড়ে চলে নয়ন।

ময়নার শৈশবের কথা মনে পড়ছে—আর মনে পড়ছে কি করে ওরা এখানে এলো। ওর জন্মের কথা ও কিছু কিছু ওর আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনেছে। ওর বাপ ওকে এসব বিষয় কোনদিন কিছু বলেনি। মা তো মরেছে ওকে প্রসব করেই।

ওর বাপ ওকে কোনদিন কেন ওর জন্ম সম্বন্ধে কিছু বলেনি তা ময়না মানুষের মুখে একথা-ওকথা শুনে একটা অনুমান করে নিয়েছিল, আর নিয়েছিল পিতার মুখের যখন তখন কটুক্তি থেকে। হারামজাদি খানকীর ছানা।

বাপ নিজের দোষ দেখত না। সে নাকি ছিল অক্ষম পুরুষ।

দোষ নাকি সব ওর মায়ের।···

ওদের এক পূর্বপুরুষ আরব না তাতারের ধূ-ধূ করা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে

এদেশে আসে বসতি করতে—সে আজ বহু দিনের কথা। তাকে কত গিরি নদী যে ডিঙিয়ে আসতে হয়েছিল! কত গহ্বরে গুহায় যে সে রাত কাটিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে। সে সব কথা এখন কাহিনী হয়ে রয়েছে। দু'একজন বুড়ো বেদে তা জানে এবং তাদের সমাজে গান গেয়ে গেয়ে শোনায়।

সে এসে নাকি বিয়ে করেছিল এ দেশী এক হিন্দুর মেয়ে। চাকর হয়ে এক বাড়িতে ঢুকেছিল, জামাই হয়ে পালিয়ে গেল। তারা দু'জনে দেশে দেশে ঘোরে। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও খচ্চরের। রাত কাটায় তাঁবুতে।

বেদে-বৌর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হয়।

বাড়িঘর নেই, তাই তাঁবুও হয় অনেকগুলো। সেই অনুপাতে ঘোড়া গাধা খচ্চরও বাড়তে থাকে।

ক্রমে ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। আগে দু'জনার যেমন-তেমন করে চলে যেত। তারপর চলত কোনো মতে। ভিক্ষাই প্রধান উপজীবিকা।

শেষকালে যখন ওতে আর পোষায় না, তখন মগজে এলো নতুন বুদ্ধি। অল্প খেটে অনেক আয় করা যায় কি করে? প্রথম চুরি, তারপর ডাকাতি, অবশেষে খুনখারাপি রাহাজানি। পুলিশের খাতায় নাম উঠল। আঙুলের ছাপ আর ফটো তুলে নিল দলের সকলের। এখন তো আর একটা দল নয়—দল হয়েছে অজস্র, ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে। গাধা ঘোড়া খচ্চর তো আছেই। গরু ভেড়া ছাগলেও করেছে দলপুষ্টি। নাম হয়েছে ভবঘুরের দল—স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি। যে দেশের উপর দিয়ে যায়, সে দেশ একেবারে ওরা চবে খায়—গ্রাম্য গৃহস্থদের হাঁসপায়রাটাও পেলে ওরা রেহাই দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আছে, কিন্তু তাদের চোখে ধুলো দিয়েই ওরা কাজ হাসিল করে।

এমন একটা দল এককালে এসে পড়েছিল পূর্ব বাঙলার নদীবহুল দেশে। তারা শত শত বছর ধরে রুক্ষ মাটির দেশে ঘুরেছে। এমন স্নিগ্ধ শ্রী দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। কত নদী, কত জল, কত গাছগাছালি—কেমন

সব কল! মাঠ-বোঝাই ধান,—গ্রাম-বোঝাই চঞ্চলতা। প্রচুর আহার্য আছে এখানে, নইলে এত কলরব থাকতে পারে না।

ওরা গাধাঘোড়া বেচে কিনল পরিবার-পিছু একখান করে নাও। জুড়তে লাগল লগি বৈঠা দড়ি কাছি নোঙর। ঝাঁপি তৈরী করে ভরে নিল জরি-বুটি নানাবিধ লতা-পাতা ওষুধ-পত্তর। সাপখেলা দেখান একটা পেশা ছিল। তাই সাপের ডালা কেউ আর ফেলল না।

এতদিনে যাযাবরেরা যেন একটা স্থাবর সম্পত্তির আস্বাদ পেল। নায়ে নায়ে বাতি জ্বলল। রান্নাবান্না হতে লাগল গৃহস্থের বাড়ির মত। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দৌড়াদৌড়ি নেই পুলিশের তাড়ায়। এখন আর ওরা চোর ডাকাত নয়—বেদে-বৈদ্য। বেদেনীরা দেখায় সাপের খেলা।

একটা স্নিগ্ধতা ফিরে এসেছে নতুন জীবনে।

এমনি ক'পুরুষ কাটল কে জানে!

অমনি একখানা নায়েই একদিন জন্মেছিল ময়না।

বড় হয়ে বাপের সঙ্গে ধরেছে হাল, নৌকার মাস্তুলে বিচিত্র জোড়াতালি দেওয়া পাল তুলে খাড়ি নদীতে পাড়ি জমিয়েছে। ধূ-ধূ জল—এপাশে ওপাশে শুধু ছলবল করছে ঢেউ।

টানা বাতাসে ফুঁপিয়ে চলছে নাও।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর গাঁ চুঁড়ে যা তারা সংগ্রহ করে আনত তা যখন সন্ধ্যাবেলা উনুনে চাপিয়ে জ্বাল দিত, তখন ভাল লাগত শুনতে পূর্বপুরুষের কাহিনী—বীরত্বের, দম্ভের, মরুভূমির ঝড়ের, দাবদগ্ধ মৃগতৃষ্ণিকার।

তাদের সংস্কার ছিল এবং এখনও আছে, স্ত্রীলোক সন্তানবতী না হলে নাকি তার নরকেও স্থান হয় না। ময়নার জন্মের কাহিনী তাই একটু রহস্যপূর্ণ। হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। তার মা তো এখন সুখে আছে মরে।

ময়নারও সন্তান চাই।

কিন্তু এ সংসার আসার। কি অপূর্ব কথা শোনাল ভৈরব!

[চার]

কেমনটি করে রঙ করি কাপড়ে বলতো গোঁসাই? আমাদের চৌদ্দ-পুরুষে এসব কি কেউ করেছেক!

এর মধ্যেই তুমি সব জোগাড় করেছ—চমৎকার! কই নিয়ে এসো তো দেখি।

বিশ্বেস হচ্ছেক নি বুঝি? এই দেখ।

তোমাকে সুন্দর মানাবে—যৌবনে যোগিনী!

ময়না অর্ধেক লজ্জায় অর্ধেক বিস্ময়ে বাঁকা চোখে তাকায়।

ভৈরব ময়নাকে বুঝিয়ে দেয় কতটুকু জলে কতটুকু গেরুয়া মাটি গুলতে হবে। কত সময় আগুনের জ্বাল দিয়ে শাড়ি ছোপাতে হবে রঙে।

ভৈরব চলে যায়। বারবার ময়নার ভুল হয়। শাড়িতে দাগ লাগে ধেবড়া-ধেবড়া। সে সব কিছু সঠিক ধরতে পারে না।

টানটান করে ঘাসের ওপর শুকোতে দেয় শাড়ি। যতক্ষণ না শুকোয় ততক্ষণ সে থর দৃষ্টি রাখে, কিন্তু শুকনো কাপড় তুলতে গিয়ে মনটা তার কেমন যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়।

কিন্তু ভৈরব সেদিন আর আসে না।

কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে সারাটা রাত কাটায় ময়না। তার থাওয়া-দাওয়ায় মন বসে না। বসন না হলে বাসনা তার কমবে না। বৈরাগ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করার ঐ নাকি প্রথম সোপান। তারপর ভজন শিখতে হবে। মিশিয়ে দিতে হবে, রঙিয়ে নিতে হবে দেহ মন ঐ গেরুয়া রঙে। ও তো রঙ নয়—রস। আরও কত বিচিত্র ব্যাখ্যা যে ভৈরব

করেছিল তা কি ছাই ময়না বুঝেছে! কিন্তু কেন জানি তার বড় ভাল লেগেছিল।

আর তার মনে দাগ কেটেছে ভৈরবের আত্মভোলা রূপ, তার বলিষ্ঠ গঠন, খাড়া নাক—বিহ্বল চাহনি।

পরের দিনও ভৈরবের দেখা নেই। ময়না খোঁজ নেয়। মহেশ কর্মকার বলে: সে নাকি ভৈরবকে বংশীতলার দিকে যেতে দেখেছে—হাতে তার এক-তারা, কাঁধে ঝুলি। বোধহয় ভিক্ষায় বেরিয়েছে।

ভিক্ষায় বেরিয়েছে! কেমন যেন একটা দুঃখ হয় ময়নার। একটু যেন রাগও জন্মে বুনো মনে। ভিখারী ভিখ্ মাগুতে যাবে এ তো স্বাভাবিক কিন্তু তার ওপর রাগ করাটা কি অস্বাভাবিক নয়? উচিত ছিল ময়নাকে একটু বলে যাওয়া। কিন্তু কেন ভৈরব তা যাবে? তার এমন কি ঠেকা যে সব কাজ সব সময় জানিয়ে করতে হবে বেদেনীকে? না, না, সে কথা তো বলছে না ময়না। তবে কিনা একটু জানিয়ে গেলে শাড়ি ছোপান নিয়ে এমন গোলমালে পড়তে হ'ত না তার।

কাঠ নেই বাসায়। ময়না ঝাঁপ টেনে দিয়ে উঠে চলে যায় পদ্মদীঘির উঁচু পারে। হাতের আঁকশি ঘাসের বুক চিরে চিহ্ন রেখে যায়।

কত শুকনো ডাল আম গাছের, কত শুকনো পাতা তাল গাছের তলায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কিন্তু সে সব যেন ময়না দেখতে পায় না। সে আনমনে ঘুরতে থাকে। শেওড়া ঝাড়টা সে কবার যেন প্রদক্ষিণ করে। একটা মেঘডম্বরু সাপের মত মোটা লতা—যাতে জড়িয়ে ধরেছে আমলকীর মসৃণ দেহটা—তাই নিয়ে সে মিছামিছি টানাটানি করে। কতগুলো মৌমাছি উড়ে যায়, কতগুলো বোলতা গুমরে ওঠে, কতগুলো নাম-না-জানা ছোট পাখি ফুরফুর করে পালিয়ে যায় বিরক্ত হয়েই যেন—তবু ময়নার খেয়াল হয় না। অনেকক্ষণ বাদে যখন তার মনে হয় যে সে এসেছে কাঠ কুড়োতে তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর।

তখন সে কাঠ কুড়ায়। এমন কাঠই সে ভেঙে চুরে কুড়িয়ে জড়ো করে যে বোঝা হয় একটা যোয়ান মরদের। লতা দিয়ে বাঁধে—শক্ত করে, টেনে টেনে।

এখন বোঝা তার মাথায় তুলে দেবে কে? ধেৎ ছাই! এত বড় আঁটি না বাঁধাই উচিত ছিল তার। কালিন্দী লতার ফালি দিয়ে বাঁধা বোঝা আর তার খুলেও বাঁধতে ইচ্ছা করে না নতুন করে।

কি করবে সে এত কাঠ দিয়ে? এত সঞ্চয় তার কিসের জন্য?

কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যায় শুকনো পাতার ওপর।

কে রে?

আমি নয়ন।

কি চাই? হামার ঠেয়ে না পুঁছে ক্যান্ ঢুকলি বাগানে?

নয়ন থতমত খায়। কাঠ কুড়াবার হুকুম নেওয়ার রেওয়াজ তো নেই এদেশে।

বুইন দিদি—

ইদিকে আয়। ময়নার হাতে একখানা বেঁকি দা।

নয়ন ইতস্তত করে।

কিরে? হামার কথাটি বুঝি কানে যায় না তাঁতির পো?

নয়ন আর কি করবে—অগত্যা এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসে। যদি ছুটে পালায়, বেদেনী ওর পিছে পিছে ধাওয়া করে যাবে সাপের মত। একবার রাগ হ'লে ওদের বাগ মানায় কে! বুক দুরু দুরু করতে থাকে নয়নের।

তোল, ধর এই বোঝাটি। বেকুপের লাখন হাঁ করে রইলি যে? গিলবি নাকি হামাকে?

নয়ন বোঝা তোলে ময়নার সঙ্গে ধরাধরি করে। ময়না ঠেলে দেয় আঁটিটা নয়নের মাথার ওপর।

ওকি? নয়ন জিজ্ঞাসা করে, ওকি করো বুইন দিদি?

জাত বেকুপ—মাথাটি পাত, তারপর সোজা গাঁয়ের পথে হাঁট।

ময়নার হুকুম অমান্য করতে নয়ন আর সাহস পায় না—বাদানুবাদ তো দূরের কথা।

ময়না হাসতে হাসতে আশ-পাশে যে শুকনো ডালপালা পড়ে ছিল তাই দিয়ে ছোট্ট একটা আঁটি বেঁধে নিয়ে চলে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে জমিয়ে কি করবে ?

ময়নার আর খাওয়া-দাওয়ায় মন বসে না। কোন রকমে চারটি ভাত রেঁধে মুখে দেয়। মন ওর গেরুয়া রঙে মেতেছে। বসন নইলে চলবে কেন? ভিতর ও বাহির এক রঙে রাঙিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু ছোপ তো ধরলো না শাড়িতে—নিবিড় ঘন ছোপ! একটা উপায় আবিষ্কার করতেই হবে তাকে। এটুকুও না করতে পারলে ভৈরব এসে বলবে কি? ঠাট্টা করবে, নয়তো হাসবে। কিন্তু তা সইতে পারবে না ময়না। ওরা জংলি মানুষ। হয়তো ধাঁ করে রেগেই যাবে! বাঁশের খোপ থেকে একটা পাতা এনে ময়না মোটা একটা বিড়ি তৈরী ক'রে ধরিয়ে নেয়। চিন্তার সাথী তো তার আর কেউ নেই এ দুনিয়ায়!

ধর্মের একটা ক্ষীণ গণ্ডি আছে এই বেদেদের মনে, কিন্তু বদ্ধমূল কোন সংস্কার কিম্বা রীতিনীতি মেনে চলার বালাই নেই। না আছে কোন বিশেষ অনুশাসন। এরা মুরগী খায়, আবার পায়রা এক জোড়া মানত করে মা-মনসার দুয়ারে। জাগ্রত মনসা, ওদের রক্ষিত মনসা আছেন পদ্মদীঘির পারে ঐ উঁচু কামিনী ফুলগাছটার ঢিপির ওপর একখানা ছনের ছাওয়া চৌচালা ঘরে। রোজ সেখানে সন্ধ্যাবাতি দেখায়, ধূপ পোড়ায় পাঁজালে। জগতে নাকি আল্লা, ভগবান, মা-কালী সকলের চেয়ে তেজস্বিনী এই দেব মহিলা। তার ভুরি ভুরি নজির আছে পদ্মপুরাণে, ভাসান গানে। ইচ্ছা হ'লে একখানা গান শুনিয়ে দিতে পারে ময়না। কি গান শুনতে চাও? চাঁদ-পদ্মার বাদের গান—না স্বামীহারা বেহুলার করুণ কাহিনী? লক্ষীন্দরকে নিয়ে ভেলায় করে ভাসছে রূপসী বেহুলা। তার অশ্রুজল দেখে এমন যে গর্বিতা মা-মনসা

তিনিও কাঁদছেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে পারছেন না, কারণ তখন পর্যন্ত নাকি মাথা নত করেনি ঐ দাম্ভিক বেনে।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। একটা গান ধরে ময়না। বাতি জ্বালায়। তারপর এগিয়ে চলে মণ্ডপের দিকে। ধূপদীপ জ্বালিয়ে দিয়েও চোখ ভরে রূপ দেখে দেবীর। ঘটের ওপরের আঁকা ছবি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর কাছে। কি চাহনি, কি লাবণি অনুপম ঠোঁটে! কেমন প্রকাণ্ড নথটা কান পর্যন্ত টানা। হাতে বিষধর ফণান্বিত সর্পিণী।

মহুয়ার চেয়েও মিঠা এ রূপ ময়নার কাছে। তার সমস্ত চেতনা নেশায় ভরে যায়। সে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে থাকে। যেন মেঘ দেখে নাচছে এক ময়ূরী—গুরুগুরু মেঘ।

না, না, বেদের বাঁশীর তালে তালে যেন নাচছে ফণা তুলে এক ভুজঙ্গিনী। দুরুদুরু বুকে চেয়ে দেখে নয়ন। সাহস হয় না তাঁতির এ তাল ভাঙতে। সে কেন জানি বেদেদিদির কাছে এসেছিল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অপলক চোখে। তার গেঁয়ো মন তখন ভক্তি ও ভাবে ভরপুর।

একটা কালো সাপ এসে ঘটের কাছে লিক লিক করছে জিভ। তারপর সেও যেন খানিক চেয়ে থাকে নৃত্যরতা ময়নার দিকে। কান আছে কিনা কে জানে। তবু মনে হয় সেও যেন শুনছে গান।

ময়না গাইছে: ও মা বিষহরি...মা মা মাগো...

তার গান শেষে হওয়ার আগেই দুধটুকু খেয়ে সাপটা ধীরে ধীরে চলে যায়।

বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে থাকে নয়ন।

কি রে, তুই কখন এলি বান্দর?

বুইনদি, ওডা কি সত্যিই সাপ?

হয়রে—রোজ আসে, আশ্চজ্জি। তামার টাটের দুধটুকু খেয়ে লিয়ে ভাগ্‌নী হামার সরে পড়ে।

নয়ন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মা-মনসাকে এবং আজ প্রথম পায়ের ধুলো নেয় ময়নার। তুমি দেবতা।

লয়রে পাগলা, তা লয়। ও মা-মনসার ছাওয়াল। হামার তোর মতন।

নয়ন চুপ করে শোনে।

তোর বুঝি বিশ্বেসটি হচ্ছে না। হামার কোন গুন-জ্ঞেয়ান নেই ওতে—সত্যি সাপ।

ক্যামনে আইল ?

জানি না ভাইটি। রোজ আসে, ভাগ্‌নী হামার ওখানটিতে কোন গর্ত্তে থাকে যেন্।

ময়না নয়নের চোখে আজ এমন এক নারী হয়ে ওঠে—যে নারীর ভিতরে দুর্জ্জেয় সমুদ্র, বাইরে শুধু একটা রূপের কৃষ্ণ দ্যুতি।

বাসার দিকে এগোতে এগোতে ময়না প্রশ্ন করে, সাঁঝের আঁধারে তুই পদ্মদীঘির পারে ঘুরিস ক্যান্? লতার (সাপের) ভয় নেই ? যে গরমি—তাতে জংলা জমীন্।

তোমারও তো ভয় নাই বুইনদিদি ?

একটু খিল্ খিল্ করে হাসে ময়না। হামি মরলে কেহ তো কাঁদবেক নি।

আমারই বা আছে কেডা ? পরের বাড়ি ভাগে তাঁত ঠেলি, তার বদলে খাইতে দেয় তারা। সেও রাইন্ধা খাই। ওদের রান্ধন কি খাওয়া যায় ? আয় যা করি তাতে খাওয়াইতে পারি আমার মতো পাঁচটা। সারা দিনই তো খাটি, রাত্তিরে আবার কি ?

হামি একলাটি থাকি, হামার সাথে থাক না। দশটি পাঁচটি না—একলাটিরে খাওয়া না মরদ। হামি ভাত ছালুন রেঁধে দেবেক, তুই বসে বসে খাবেক।

ওরা বাসার কাছে এসে পড়ে।

ক্যামন, চুপ করে রইলি যে !

আচ্ছা, সাপটা দেইখা তোমার ডর করে না?

ডর কিসের রে? হামার ঠাঁই ও ঘিঁষবেক না। আসল জরি আছে হামার কাঁথালে।

আমারে একটু দিও—দেবা?

ওস্তাদের মানা আছে ভিন্ জাতের নোককে আসল চিজ দিতে।

আসল জরি থাকতে তোমার সোয়ামী মরল যে বুইনদিদি?

আসল চিজও ঝুটা হয়ে যায় ছোঁয়াপাণি নাগলে। ক্যামনে জানি তা লেগেছিলেক।

নয়নের ইচ্ছা করে রাত্রির এই অন্ধকারে সর্পজগতের সমস্ত কেউটে গোখরা কালিন্দীকে বশ করতে। কিন্তু বশীকরণের মন্ত্র ও ওষুধ সে তো জানে না। কেন সে বেদে হয়ে জন্মালো না এক বেদিনীর কোলে? তা হ'লে তো সে একটা তুবড়ি নিয়ে, ঝাঁপি কাঁধে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারত। বসে বসে তাকে আর তাঁত ঠেলতে হ'ত না। আজ ময়নাও তাকে এত পর পর ভাবতে পারত কি?

একটি বিড়ি খাবিক? ময়না একটা বিড়ি ধরিয়ে গোটা কয়েক টান দিয়ে নয়নের হাতে দেয়। কাঁচা গাছ-তামাকের বিড়ি।

বেশ কড়া লাগে নয়নের কাছে।

ও সব জরি বুটির কারবার না শিখলেই ভাল। বড় ঝামেলা। একবার শুনলেই ছুটতে হবেক রাত-বিরেতে—মা-মনসার হুকুম।

ক্যান্?

রুগী না দেখলেক গুণ থাকবেক না বস্তির।

একটা অসুবিধা বটে—তবু লোভ হয় একটা ভিন্ন জগতের পরিচয় জানতে। আজ হ'ক কাল হ'ক নয়ন একদিন তা শিখবে…কিন্তু সে যে ভিন্ জাতের ছেলে!

কত রাত হ'ল এখন, বাসায় যাবিনা তুই?

উসখুস করে নয়ন। মন্তর না শিখাইলে যামু না।

এত সহজ লয়রে তাঁতির পো, এত সহজ লয়। ভিন্ জাতকে হামরা কিচ্ছু শিখাবেক না।

আমি বাইন্থা হমু—জাইত দিমু।

জাইত দিবি! নোকে কি বলবে?

আমার আছে কেডা বুইনদিদি? কার জন্য ভয় করুম?

আজ তবে যা, কাল আসবিক। দিনের বেলা জাত দিবিক বুঝলি? রেতের কথা কেউ বিশ্বেস যাবেক না। দোষ দেবে হামাকে।

ময়না একটু ব্যংগ হাসি হাসে।

তুমি ঠাট্টা করলা, আমার মনের কথা কিচ্ছু বোঝলা না?

তোর জাইত দেওয়া লাগবেক না পাগল। সব জাইতকে হামরা মন্তর গুণ-জ্ঞেয়ান শেখাই। কিন্তু ছটফট করলেক তো হবেক না।

তবে এতক্ষুণ ঠাট্টা করলা ক্যান থামাকা?

পরখ করতে হবেকনি—এলেম দিবেক এমনি এমনি?

কবে দিবা বুইনদিদি?

একি জ্বালা! একি মাছের ছালুন, দিবেক আর নাস্তার সাথে খাবেক?

ময়নার চোখ ছ'টো একটু কৃত্রিম ক্রোধে জ্বলে ওঠে।

ময়নার মনে যাই হ'ক সে বলে, ওঠ ওঠ্।

নয়ন কি ভাবতে ভাবতে অন্ধকারেই বাসা থেকে নামে। দীঘির পারে উঠে সে একটু দাঁড়ায়। কিছু যেন দেখা যায় না। শুধু জঙ্গল ঝাড়, থমথমে কালি লেপা চারদিক।

লতাপাতার একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে ময়না ছুটতে ছুটতে আসে। খাড়া বেকুপ—খাড়া। এমন বলদও তাঁতির গোয়ালে জম্মে। লিক লিক করছেক যত নাগনাগিনী—ও চলছেক কিনা আঁধিয়ারে!

ময়না পদ্মদীঘির সীমানা ছাড়িয়ে ওকে গাঁয়ের পথে তুলে দেয়।

হ্যাঁরে লয়ন, ভৈরবকে আজ দেখেছিস কোনো ঠাঁই ?

কই, না তো !

[পাঁচ]

তমালতলার আদি বাসিন্দাই জমিদার গোষ্ঠী। তার আগে এখানে যারা ছিল তাদের কোন ইতিহাস নেই। পুরোনো দলিল পত্রে তাদের কোনও পরিচয় নেই। জলাভূমি ও জংগল আবাদ ক'রেই তমালতলার সৃষ্টি। বন জংগল আবাদ ক'রে মানুষ বসবাসের উপযুক্ত করতে কত পুরুষ যে কেটে গেছে কেউ তার হিসাব জানে না। জানতেন জমিদার বাড়ির বুড়ো কর্তারা, কিন্তু তাঁরাও এখন ছিন্নভিন্ন। কে কোথায় আছেন, কে বা মরেছেন, কোথায় তাঁদের স্বনামী বেনামী দলিল দাখিলা তার এখন আর ঠিক-ঠিকানা নেই। যদিও রেকর্ডে নাম দেখা যায় দু'চার জনের, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। তাই প্রজারা নিষ্করই জমিজমা ভোগ করে। ধোপা নাপিত ভুঁইমালীরা চাকরান খাটে না। সানদার ঢাক বাজায় না—পুজারী পূজা করে না। না আসে কোন পেয়াদা পাইক খাজনা খেসারত বেগার চাইতে।

তোরণ ভেঙে পড়েছে। কাঠ কপাট কালের বজ্রঘাতে লোপাট হয়েছে। সিংহদ্বারের সিংহগুলো শ্বেতপাথরের। শ্রীহীন ভগ্ন পুতুলের মত এখনো দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কোথায়ই বা সে দম্ভ, কোথায়ই বা সে ঐশ্বর্য! শাদা পোশাক পরা সান্ত্রীরা এককালে মানুষের মনে ভ্রম জন্মাত—সত্যই সৈনিক যেন, কিন্তু এখন তারা কেউ বা ছিন্নশীর্ষ, কেউ বা ভগ্নহস্ত, কারুর হয়তো চিহ্নই নেই মোটে। শেওলা জন্মেছে দরদালানে—নাটমন্দির

জনহীন। দেবালয় দেবতা শূন্য। একটা পায়রা পর্যন্ত আসে না এখানে। ঢেঁকির লতা ও প্রবীন বট অশ্বথ উঠেছে মাথা ঠেলে। ভাঙা দালানের পাঁজরে পাঁজরে তাদের লক্ষ শিকড়। যে সুদ একদিন এই দালানে বসে কষা হয়েছিল, যে ভেট বেগার জুলুম ক'রে আদায় করা হয়েছিল—তার যেন সমস্ত রস নিঙড়ে নিচ্ছে কালের প্রহরী এই প্রাচীন সাক্ষীগুলো। সহস্র প্রবাহিনী শিকড়-বাকড়ে, লতাগুল্মে সে সমস্ত কীর্তি লোপাট করে যেন একটা বিস্মৃতির প্রলেপ পরিয়ে দিতে চায়।

দলিলখানায় মস্ত বড় উইয়ের ঢিবি, যেন ছোট খাট একটা পাহাড়। এর বুকের তলায় পুষ্ট জীবগুলো কত শত বছরের কত তুলটের দলিল, কত প্রাচীন হস্তাক্ষর, অংগুরীর ছাপ যে খেয়েছে! মূল্যবান স্ট্যাম্প, নক্সা, রসিদ এরা অনায়াসে হজম করেছে। কোন প্রমাণিক পাণ্ডুলিপিও এদের দাঁতের কাছে রেহাই পায়নি। এরা বংশপরম্পরায় যে মাটিতে বাস করেছে সেই মাটির ইতিহাসই ধ্বংস করেছে।

অন্দর মহলে কলহাস্য নেই, প্রমোদকুঞ্জ নীরব—ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায় বেলা দ্বিপ্রহরেও। দালানের ইঁটগুলো জীর্ণ দাঁতের মতো যেন হাসছে। শিশু নেই, প্রসূতি নেই—দাস-দাসী নেই রাণীমহলে। ভেঙে-চুরে পড়েছে রাস দোলের মঞ্চ। শীতলা মন্দির প্রতিমাহীন—আছে যেন কয়েকখানা ভাঙা শাঁখা না কি যেন পড়ে! এককালে কত লোক এসে এখানে গড় হয়ে প্রণাম করত, ফণীমনসার ডালে 'ফল' বাঁধত—স্ত্রীলোকের ভিড়ে হাঁটা যেত না যে-পথে, সে-পথের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সেদিনের সভ্য ফণীমনসা আজ কতগুলো অসভ্য বংশধর রেখে গেছে, যারা কাঁটায় কাঁটায় ডালে পালায় ছেয়ে ফেলেছে রাজ্য।

রাণীমহলের পাশে দাসীমহল। মাঝখানে একটা সুউচ্চ প্রাচীর। তা আজ আর নেই, ভেঙে চুরমার হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে গেছে যেন দুটো প্রাচীন মহল। বার্ধক্যে জরায় যেন সকল শালীনতার ব্যবধান ঘুচিয়ে

দিয়েছে। রাণীদের কণ্ঠ, পরিচারিকাদের কলরব কতকাল যেন থেমে গেছে। এখন চামচিকার কিচির মিচিরে—পেঁচার ঝটপটিতে মহলে মহলে অন্ধকার কেঁপে ওঠে।

এ পরিণতির এবং ধ্বংসের পিছনে একটা সুবৃহৎ ইতিহাস আছে। গৃহবিবাদ মামলা-মোকদ্দমা জাল-জুয়াচুরির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মদ মাংস ও ব্যাভিচার। কত লোক যে এখানে তার সর্বস্ব খুইয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জমিজমা যৌবন কিছুই সে হিসাব থেকে বাদ যায়নি।

তবু আজ এদিকে যখনই কোন গাঁয়ের লোক ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে, মনে একটা ব্যথা অনুভব করে—কোন একটা অবিচার হ'লে দোহাই দেয় এই জমিদার গোষ্ঠীর। অন্যায় অবিচার ও পীড়নের কথা স্মরণ নেই কারুর—একটা মূক হাহাকারে বুক ভরে ওঠে। কেন ওঠে তা কেউ বলতে পারে না।

তবে নয়নের মামা গোপীর হাহাকার স্বতন্ত্র।

হন হন করে সে ছুটে আসে। থামে এসে একেবারে পদ্মদীঘির পারে জমিদার বাড়ির সুমুখে। জমিদার বাড়ির কর্তাদের জন্য আজ বড় দুঃখ হয় বৃদ্ধের। সে শুকনা পাঁজরা দু'খানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাপরের মতো হাঁপিয়ে নেয়। আইজ তোমরা বাইচা নাই, তাই এত অবিচার। হায়রে ভাগ্য, হায়রে হায়! একটা শাস্তি দেওয়ার জন নাই, যত দুষ্ট নষ্টরে। ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে চেয়ে সত্যই খুব আপশোষ করে গোপী।

নয়ন আজকাল লায়েক হয়েছে। কাজে কর্মে তার মন বসে না। দু'চার বার মাকু ঠেলে সরে পড়ে। কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। আরে কারে ফাঁকি ছাও, ফাঁকিতে পড়বি তুই। আমার তো তিন কাল গিয়া বাকী আছে ক্যাবল এক কাল। যে খোদে সেই গর্ত্তে পড়ে।

আবার গোপী মনে মনে বলে, থাকত যদি কত্তারা! শোনলে চাবুক মাইরা সোমান করত। টাকা পয়সা আগাম নিয়া ফাঁকি।

গোপীর বাড়িই নয়ন থাকে। এই ক'টা দিন হয় সে নাকি একটু সেয়ান হয়েছে, উড়ু উড়ু করে তার মন। সে হঠাৎ তাঁত ছেড়ে উঠে পড়ে। কোথায় কোন্ দিকে যে যায়, তা বলে যায় না। তাই গোপী খোঁজে বেরিয়েছে। তার পথ ময়নার বাসা পর্যন্ত। কিন্তু থাগে পদ্মদীঘির পারে, যেদিকে মৃত জমিদার-বাড়িটা দাঁড়িয়ে। সে নিজে শক্তিহীন, তাই নালিশ করে—দুঃখ করে শক্তিমানের জন্য।

ইতস্তত করতে থাকে গোপী—যাবে কি যাবে না বেদে মাগীর কাছে। কি কথায় আবার কি দোষ ধরে।

ভৈরবের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ময়না ঘাটলার এদিকে এসে জংগ-লের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। সন্ধ্যার রাঙা আলোতে অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন এই পুষ্পিত বনভূমি। সে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে, শুনতে থাকে পাখি-পতংগের কাকলি। সে মনে মনে শাখা-প্রশাখা নির্বাচন করে বেড়ায় নানা বৃক্ষের। কতবার ঝুলনা বেঁধে, কতবার যে তা কাটে! রাঙা রশ্মির সূক্ষ্ম কণাগুলি যেন সিঁদুর ছিটিয়ে দিয়েছে শ্যামল লতা-পাতায়—এখন তাই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘন সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে যেন গাঢ় হয়ে আসে ভাঙা দেউল তোরণের ওপর দিয়ে। কেন, কতক্ষণ যে ঘুরে বেড়ায় ময়না তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু এক সময় সে রেরিয়ে আসে কালো খোঁপায় একগুচ্ছ শাদা ফুল পরে।

সন্ধ্যার আবছায়াতে পেত্নী দেখলে যেমন ভয় পায় তেমনি ভয়ে বিস্ময়ে পিছিয়ে আসে গোপী। না, পেত্নী নয়!

কি মামা?

দামড়াডারে খুঁজি

ময়না হেসে জবাব দেয়, ইদিক তো আসেক নি।

গোপী সে কথায় ভোলে না। সে অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আছে। একটা এলো, আর একটা কি উধাও হলো? ময়না

ওপারে তার বাসায় গিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। সাঁঝ বাতির জোগাড় করে নিয়ে যায় মণ্ডপের দিকে, তখন নিরুপায় হয়ে গোপীও বাড়ির দিকে ফেরে!

খটাখট মাকু খেলছে, দ্রুত শব্দ হচ্ছে তাঁতের হাতলের। গোপী ঘরে উঠে মনে মনে খুশী হয়। আরে শোনছ নি…

কি কও? বলে বেরিয়ে আসে মাতুল গৃহিণী।

আইজ রাত্তিরে ও তো সময় পাইবে না, চাউল কয়ডা একটু জ্বাল দিয়া দিও।

ক্যান্ ঠেকছি কিসে?

আরে বোঝনা ক্যান—ভাইগ্না ও যা পুত্তুরও তা।

তয় তুমিই যাও না হাঁইসালে, আমি পারুম না। এক একদিন এক এক বন্দেজ। আমি পণ্ডতি রাইন্ধা থুইছি তুফরে।

তয় আমিই যাই। মাইয়া মানুষের মন এতও দড় হয়!

নয়ন চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি কিছু ছুইলে আমি কিন্তু খামু না মামা। নিত্য রাইন্ধা খাই, আইজ বড় মায়া!

গোপী নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে ক্ষান্ত হয়। বুঝবি না, বুঝবি না তুই—যম জামাই ভাইগ্না, কেও নয় আপনা।

[ছয়]

পরদিনের কথা। একটা যেন মজলিস বসেছে গোপীর উঠনে।

তারিণী শানদার নাকি ?

হয় গোপী মামা—মাইয়া বাড়ি গেছিলাম, এই তো ফেরলাম। আইতে কি দিতে চায় ? মাছ, মাংস, দুধ—মহোচ্ছোব যেন।

আরে জামাই তোমার ভাল আছে, খাওয়াবে না ?

জামাইর ক্ষেমতা কি ! তোমাগো আশীব্বাদ মামা—

বৃদ্ধ গোপী তাঁতের মাকু ঠেলা বন্ধ করে উঠে আসে। তামাক সাজে।

না, আর তামাক খামু না।

অমৃতে অরুচি ?

বেলা কতখানি দেখ না ! গরু বাছুর থুইয়া বেড়াইতে গেছি, মনে কত চিন্তা ! বলতে বলতে তারিণী দাওয়ার ওপর বসে পড়ে। তামাকের লিপ্সা বড় লিপ্সা। বিশেষত গোপী মামার তামাক। যার নাম আছে দু'চার গ্রামে।

তুমি আসার সময় গাঙ পারে একখান নাও দেইখা আও নাই ?

আমি তো গাঙ পার দিয়া আসি নাই—আইছি সোজা বায়ন্ন বেঁকির খাল পার হইয়া—আন্ধারমণির মাঠ ভাইঙা। আড়াআড়ি পাড়ি দিছি। আমার লাল গাইটা বিয়াবে, মনে বড় চিন্তা। রাইত বিরাইতে বিয়াইলে কেডা বাইর হইয়া খোঁজ লয়, আগুন জ্বালায়, বাছুরডারে তাজা করে। বড় সাধের গাই। গত বছর বিয়াইল না—দুধ খাইয়া যাইতে পারল না মাইয়াডা।

পুলিস সাহেব আইছে। কে যেন বলে।

ক্যান্ ? তারিণী নিজেই যেন কোনও মামলার ফেরারী আসামী এমনি

একটা মুখের ভাব ক'রে তামাকের কল্কিটা নামিয়ে রাখে। ক্যান্ বাবা, পুলিস সাহেব ক্যান্?

অম্বিকা শুদ্ধ করে দেয়, বাবা নয়, মামা। তারিণী, গোপী তোমার মামা। এমন ব্যাকরণ ভুল তোমার মতো বুড়োর তো হওয়া উচিত নয়।

দেখতে দেখতে আর একজন আসে। কাঁধে তার লাঙল যোয়াল। সেও বলে. জমাদার লয়, দারোগা লয়, একেবারে পুলিস সাহেব। তোমার ঘাশে তোমার ঘাটে গিয়া লাও ভিড়াইলে পণ্ডিত, কি আর কমু—তারিণী খুড়ায় তো একবার গোপী মামারে বাপ. বোলাইছে, তুমি বোলাইতা দশ বার। দেখ, কারে মারে কারে ধরে—গেরামডারে ভাইজ্জা খাইবে। সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। এই অবকাশে জাবেদালা তারিণীর হাতের কল্কিটা নিয়ে একটা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পালায়।

তমালতলা গ্রামটাকে একেবারে একটুখানি বলা চলে না। তবে এ গ্রামে বড় লোক কেউ নেই। সকলেই গরিব অথবা নিম্ন-বিত্ত। শানদার, ভুঁইমালী, কামার, কুমোর, তেলি, নাপিত ছত্রিশ জাতির বাস। নমঃশূদ্র এবং তাঁতিও আছে কয়েক ঘর—তারা থাকে গাঁয়ের দক্ষিণ সীমানায়। তাঁতিরা তাঁত বোনে, নমঃশূদ্ররা হালহালুটি করে। মুসলমানও ঘর দশেক এসে বাড়ি করেছে গাঁয়ের উত্তর দিক ঘেঁষে একটা ছোট খালের ওপারে। খালটার মধ্যে এদের চলাচলের জন্য ছোট ছোট ডোঙা নাও প্রায় প্রত্যেকের ঘাটে বাঁধা আছে—কেউ বা ডুবিয়ে রেখেছে। পূর্ববংগে নৌকা ছাড়া কোন গৃহস্থের চলে না। আর এ সব নাও যে যার নিজেরটা নিজেই গড়িয়ে নেয়। লাগে তো বড় তিনটা সুপারিগাছ, আর পোয়া পাঁচেক দেড় ইঞ্চি পেরেক। হাট বাজার করা, মাছ-কুইচা ধরা, বৌ-ঝিদের যাওয়া আসা, হাল-লাঙল পারাপার করা—সব রকম গৃহকাজের সাথী ঐ ডোঙাখানা। তাই নৌকার জন্য এদের অত্যন্ত দরদ।

অবস্থা কারুরই বিশেষ ভাল না বলে এখানে আলস্যটা সাধারণ পল্লীগ্রামের

মত দানা বাঁধতে পারেনি। কামার বাড়ি সারা রাতই হাতুড়ি চলে, ফিন্‌কি দিয়ে জ্বলন্ত লোহা ছিটকে পড়ে অন্ধকারে। স্যাঁকরা বাড়ি টুক-টাক শব্দের বিরাম নেই, কুমোর পাড়ার বৌ-ঝিরা রাত থাকতেই ওঠে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, বারমাস তাদের হাত পা জিরোয় না, কাদা ছানা চলছেই। পুরুষেরা নাওয়া খাওয়ার ফুরসুত পায় না—অনবরত চাক ঘুরাচ্ছে। কখনো গড়ে হাঁড়ি, কখন বা কলসি—আজকাল মরসুম এসেছে নকসী বাসনের। তাঁতি বৌদেরও বিশ্রাম নেই। তারা তাঁতের টানা দিচ্ছে, এই চরকা ঘুরাচ্ছে, আবার উঠে উঠে কোলের ছেলেকে দিচ্ছে বুকের দুধ। এক একটা ছেলে বাঁদরের বাচ্ছার মতো মাকে জড়িয়ে ধরে। মা ওদের কাছে জন্মাবধি অনায়াসলভ্য নয়, তাই একবার পেলে আর নিষ্কৃতি দিতে চায় না। বুড়ো শ্বশুরশাশুড়ী এতে বিরক্ত হয়।

এসব গৃহস্থেরা জমিদার বাড়িরই সৃষ্ট এবং পুষ্ট। কিন্তু যখন থেকে ঐ বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হয়েছে তখন থেকেই এরা স্বাধীন ব্যবসা ধরেছে। কবে মালী যোগাত ফুল, কুমোর গড়াত প্রতিমা, শানদার বাজাত ঢাক—এখন আর তা কেউ স্মরণ করতে পারে না। তবে বুড়ো ত্রিদিব পূজারী কিছু কিছু জানতেন। তিনিই নাকি ছিলেন রাজবাড়ির বড় হিস্যার শেষ পুরুত। মারা গেছেন গতবার একশ' উনিশ না বিশ বছরে যেন পা দিয়ে।

সময় সংক্ষেপ সকলেরই। তাই এমন পুলিশ সাহেবের কাহিনীটাও জমতে গিয়ে জমে না। জাবেদালী তো আগে ভাগেই পালিয়েছে। তারিণীর তো মন কখন থেকেই উড়ু উড়ু!

গোপী কল্কিতে হাত দিয়ে একেবারে অবাক! জাবেদালীটা তো আচ্ছা নেশাখোর—এক টানেই পুড়িয়েছে পুরোপুরি এক ছিলিম। কেউ একটু প্রসাদও পেল না।

সে রীতিমত রাগ দেখাত, কিন্তু ইতিমধ্যে সংবাদ এলো যে গ্রীন বোটে

ডেকে নাকি নয়নকে হাত কড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে পুলিস সাহেব। নৌকা এখন প্রায় বাঁক ছাড়িয়েছে।

বেশ হয়েছে—কেন যায় পুলিসের নৌকার কাছে? পণ্ডিত বলে।

জাবেদালী ফেরে। যা কইলাম, ওর ফল তো দেখলা হাতেহাতে।

আমার যে বড় তাঁতখানাই অচল হইল অম্বিকে। গোপীর কান্না আসে।

এখন থানায় চলো। পণ্ডিত নির্দেশ দেয়।

আমার তো চৌদ্দ পুরুষেও কেও থানায় যায় নাই। আমরা চোর, না ডাকাইত যে এখন থানায় যামু তাঁত থুইয়া?

থানায় কি শুধু চোর ডাকাতেই যায় গোপী মামা? বিচার ব্যবস্থার জন্য সকলেই যেতে পারে।

বিচার বেবস্থা—কইছ ভালই! ওরা ছ্যামরাডারে ধইরা লইয়া গেল ক্যান্ জোর কইরা? আহারে, অনাথ ছ্যামরাডা! ওর লাইগা কি আমরা স্বোয়ামী ইস্তিরিতে কম করছি! গোপীর কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।

এক দুফর তাঁত কামাই না দিয়া উপায় কি গোপী মামা? জাবেদালী পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে বসে। কই একটু তামাক দাও তো মামা।... নয়ন তোমাগো পুত্তুরের মত।

ওডার একটু বুদ্ধি কম, তা নইলে খায় ভেন্ন চুলায় রাইন্ধা—তুমি কি ওরে মামী, কম খাইতে দিতা, না কম ভালবাসতা? একেবারে আহাম্মক।

গোলমালের মধ্যে মামী একটু বেশী তামাকই বার করে দেয়।

হারামজাদি, তুই খোয়াবি সংসারডা। তোর খাইর লাইগাই তো জাল লইয়া গাঙ পার গেল ছ্যামরা। এখন তুই যা থানায়!

এদিকে যে প্রায় দু'সপ্তাহ হাট হয়নি তা গোপীকে কে বলে।

বাদানুবাদ অনেক হয়। অবশেষে সাব্যস্ত হয় অম্বিকা পণ্ডিতই থানায় যাবে। একে তো বড় তাঁতখানাই বন্ধ—গোপী গেলে ছোটখানাও চলবে না।' অম্বিকা তা বুঝে একা যেতেই রাজী হয়।

গোপী স্ত্রীকে ডেকে গোপন এক স্থানে নিয়ে যায়। প্রায় পাঁচ মিনিট পরামর্শের পর স্থির হয় যে পণ্ডিতকে এখান থেকে খেয়ে রওনা দিয়ে যেতে বলা কর্তব্য। যার ঘর সংসার আছে, তার ঘরে একদিন একজন অতিথি খেলে আর হবে কি! কিন্তু নয়নটা যে গোঁয়ার এসব কি বুঝবে? হ্যাঁ, পণ্ডিতের জন্য যেন দু'টো আলু ভাতে দেওয়া হয়—ঐ যে দিন কুড়ি আগে সে আড়াই পো আলু এনেছিল।

তখনই পণ্ডিত লাঠিখানা বেড়ার গায়ে হেলিয়ে রাখে। মামী চরকা বন্ধ ক'রে ভাত চড়াতে যায়। গোপী হাঁসফাঁস করতে থাকে। একা সে তাঁত চালাবে না চরকা ঘুরাবে—যেদিক না যাবে সেইদিকই অচল।

উচ্চ প্রাইমারী ফেল হলেও পণ্ডিত জ্ঞানের আধার। সে কেবলই তামাক সাজে আর গোপীর হাতে দেয়। তারপর তেলের বাটি চেয়ে খুব করে রুক্ষ চুলগুলো চপচপে করে। পা হাত বুক পিঠ এমন কি দেহের পশ্চাদ্দেশও অতি যত্নে পালিশ করতে ভোলে না।

পণ্ডিত সবেমাত্র স্নান করে এসেছে, বুড়ো বয়সের মেয়েটা বায়না ধরেছে মাই খাবে বলে—মামী তো অস্থির। ভাতের ফেন গালতে গিয়ে হাঁড়িটা হড়কে যায়। এখন উপায় কি? ভাতগুলো আবার এসে না দেখে ফেলে গোপী। এর মধ্যে সে দু'বার এসে প্যান প্যান ক'রে গেছে পণ্ডিতের তেল মাখার বহর দেখে। এখন আবার রান্না ঘরে এই দুর্দৈব!

এমন সময় ডাক পড়ে মামীর।

ভগমান আমাকে নেও।

উঠানে হাসি শোনা যায় নয়নের। হাতের খাড়ইটায় এক খাড়ই মাছ। সে সকলকে বিস্মিত করার জন্য মাছগুলো উঠানেই ঢেলে দেয়। রকমারী জ্যান্ত মাছ। চিংড়ি, বায়লা, ফলি আরও কত কি।

সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। মাছ দেখে নয়—নয়নকে দেখে।

গোপী জিজ্ঞাসা করে, তোরে মারে নাই?

মারবে ক্যান্?

নয়ন তো এসেছে অম্বিকে—তা হ'লে···

এখান থেকে খেয়েই পাঠশালায় যাব। একটু বসি, মাছ কুটে মসলা বেটে নিক মামী—ব্যস্ত কি! কতদিন এমন মাছ দেখিনি।

ভবানীর বৌ যে বইসা থাকবে পণ্ডিত তোমার জন্য রাইন্ধ্যা?

সে তো আমার বাঁধা গোয়াল! রাত্রে গিয়ে জাবর কাটব। এ বেলা এখানেই। মামী একটু তাড়াতাড়ি এদিকে এসো। বিড়ালগুলো সব ওৎ পেতে আছে।

ঘণ্টা দুই বাদে পণ্ডিত পেটটি টিন টিন করে উঠে যায়। সে বড় খুশী। মামীকে তোয়াজ করে সে মাছের ঝোল, ভাজা, অম্বল সব রকমই খেয়েছে।

এবার চলি মামা।

গোপী একটু কাষ্ঠহাসি হাসে।

এবং কিছুক্ষণ বাদেই সে খেউড় জুড়ে দেয়।

তার স্ত্রী, নয়ন এবং পণ্ডিত কাউকেই সে বাদ দেয় না।

ও বাড়ির রাসুর মা ভয়ে এ দিকে আর পা বাড়ায় না—কারণ কাল নাকি তার সঙ্গে গোপীর সামান্য একটু বচসা হয়েছিল একটা বাছুর নিয়ে।

[সাত]

ভৈরব আসেনি। একরকম ভালই হয়েছে ময়নার। সে এখনো শাড়িতে ভাল ক'রে গেরুয়া ছোপ ধরাতে পারেনি। মনটা তার ভাল না। ভৈরব এসে পড়লে সে লজ্জা পাবে এ যাত্রা।

একটু রাত থাকতেই ময়না ওঠে। হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হ'তে পূবদিক ফর্সা হয়ে আসে। শাড়ি দু'খানা হাতে ক'রে গাঁয়ের দিকে যায়।

এত বিহানে যে বুইনদিদি ?

তুই একটা কাজ করবিক লয়ন ? একটা উপ্‌কার ?

কি ?

হামার শাড়ি দু'খানা ছুপিয়ে দিবিক ? এই যে গেরুয়া মাটি।

এ আর পারবে না নয়ন—খুব পারবে। নয়ন মাথা নাড়ায়।

হামি সব লষ্ট করেছি।

কিছু জানো না, ক্যান্ বিদ্যা জাহির করতে গেলে ?

তোদের সাধু বল্‌লেক, হামি কি করি বলতো ভাই ?

কে আবার আমাদের সাধু ?

ভৈরব।

ও !—একটু হিংসা হয় নয়নের। কিন্তু সে তা চেপে যায়।—গেরুয়া শাড়ি পইরা কি করবা ? বিবাগী হবা নাকি বুইনদিদি ?

হামার কে আছেক আপনজন ? এ দুনিয়া আন্ধার রে লয়ন। কি হবেক আর দুনিয়াই, বাসন্তিবাহার পরে ?

নয়নের ভারি দুঃখ হয়। সে যদি বেদে বোনের কেউ হ'ত! আর কিছু সে না পারলেও ময়নাকে বিবাগিনী হ'তে দিত না। নয়ন অনেক

কীর্তন এবং ঢপ গান শুনেছে। দেখেছে শ্রীরাধার বৈরাগিনী হওয়ার জ্বালা। সেই আগুনে জ্বলতে চাচ্ছে ময়না—একি সহ্য করা যায়!

ভৈরবকে পেলে হ'ত! এমন পরামর্শও মানুষ মানুষকে দেয়!

নয়ন কি যেন বলতে যাবে, দেখে যে বেদেনী নেই। সে প্রায় পদ্মদীঘির পাড়ের কাছাকাছি হয়েছে।

একবার নয়ন ভাবে যে শাড়ি ছোপাবে না। আবার স্থির করে বেদেনীকে চটালে সে সর্প জগতের বশীকরণের মন্ত্রও শেখাবে না। ওর বেদে-বোন্ কম নয়! চলন্-বলন্ অনেকটা সাপের মতো। সব কিছু ঠিক-ঠাক বোঝা কঠিন।

নয়ন তাঁত বন্ধ করে শাড়ি ছোপাতে লেগে যায়। কিন্তু গোপীর নজর এড়ায় না।

আজ কাল তুই বাইত্যা মাগীর কাপড়ও রং করতে শুরু করছ? তোরে লইয়া কেউ খাবে না।

না খায় না খাউক। আমিতো পয়সা লই না।

তয় খাতিরডা কি শুনি?

খাতির আবার কিসের? বাইত্যা বুইন কইল—একটু রং কইরা দিলাম।

পেত্নীর উপর এত টান! ঘাড় মটকাইয়া আবার কোন্ শ্যাওড়া গাছে না ঝুলাইয়া রাখে।

মামা তুমি যা তা কইও না।

যা তা কইলাম কি? কইছি তো সত্য কথা—পেত্নীর প্রেমে পড়ছ।

নয়ন গুম হয়ে নিজের কাজ ক'রে যায়।

আবার একটু পরেই গোপী বলে, ঐ শালীই খাইল ছ্যামরারে। অল্প বয়সের রাড়ী, বজ্জাতের হাঁড়ি। টালুর-টুলুর চায় কেমন চাইর দিকে, কেবল ঠাহরে ঠাহরে কথা। মাগী লাং খোঁজে।

নয়ন খাঁ করে একটা লাঠি নিয়ে ছুটে যায়। আইজ তোমার একদিন আর আমার একদিন মামা।

আসলে গোপী যথেষ্ট ভয় করে নয়নকে। সে তড়াক ক'রে উঠে তাঁতের আবডালে পালায়। কিন্তু ঘেউ ঘেউ করতে ছাড়ে না। আয় দেখি—আয়। ব'লে একখানা তাঁতের ডাব টেনে নেয় রোগা লিকলিকে হাত দিয়ে।

মামী এসে বলে, কি যে লাগাইলা সকাল বেলা! তুই তোর কামে যা নয়ন—লক্ষ্মী আমার।

কমু না, কাইল তাঁতটা কামাই গেছে, আইজও যাইবে বুঝি? কুহকে পড়ছে হারামজাদা।

কও, কও—তোমার তো মুখে ট্যাক্সো নাই। ওরা মা-মনসার বংশ।

আমিও চান্দো সদাগর।

কি বা রূপ, কি বা ছিরি আমার চান্দের! চান্দ না প্যাঁন্দ। মামী ভ্রূকুটি মেরে চলে যায়। নয়ন আবার গিয়ে কাজে মন দেয়। যতক্ষণ লাগার দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি সময় সে অপব্যবহার করে।

গোপী সে দিকে চেয়ে জ্বলতে থাকে।

শাড়ি রং করা শেষ হ'লে তা নিয়ে নয়ন পদ্মদীঘির দিকে চলে যায়। গোপীকে সে আজ আর গ্রাহ্য করে না।

এই নেও বুইনদিদি—তোমার কাপড় নেও।

বাঃ, বড় খোলতাই হইছেক তো রং! যার কাম তারে সাজে—লয়রে তাঁতির পো?

আকাশের রঙ গেরুয়া। সান্ধ্য গোধূলি। ময়নায়ও পরে গেরুয়া শাড়ি। আঁচলখানা বুকে জড়ায়—যেন গেরুয়া কাঁচুলি! উপরে নিচে অভিন্ন সজ্জা ময়নার ও সন্ধ্যার।

ময়না পাঁজাল জ্বালায়, ধূপ দীপ সংগ্রহ ক'রে আনে।

নয়নও চলে ময়নার পিছু পিছু। আজ দেবী যেন হাসছে। আরতির

তালে তালে বুনো ময়না ভাসান গান জুড়ে দেয়। কম্পিত দীপালোকে মা-মনসার হাতে কালনাগিনী যেন দুলতে থাকে। আজও আবার ভাগ্‌নী আসে। দুধ খেয়ে চলে যায়।

ময়নার কণ্ঠস্বর পদ্মদীঘির চারপাশে প্রতিধ্বনিত হয়। অবশেষে গান থামে। নয়ন আশ্চর্য হয়ে দেখে যে ময়না তার শাড়ির ভিতর থেকে একজোড়া শাদা পায়রা বের ক'রে দেবীর সুমুখে উৎসর্গ করছে। রক্তে রাঙা হয়ে যায় তাম্রকুণ্ড।

নয়নের কেমন যেন একটা ভয় হয়। সে জীবনে এসব কখনও দেখেনি। একটা বিরক্তি জন্মে ময়নার ওপর। ওরা না পারে বোধ হয় হেন কাজ নাই।

ময়না ভাসান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফেরে।

লয়ন, লয়ন, প্রসাদী লে।

কেউ জবাব দেয় না।

ময়না একটু হাসে। ভয় পেয়েছেক তাঁতির পো।

কিন্তু সে যে অন্ধকারেই আজ একা গেল তার জন্য চিন্তা হয় ময়নার। লতায় না কাটে—যে হিল বিল করছেক ভাগ্‌নীরা পদ্মদীঘির চারপাড়ে। সে একটা মন্ত্র আওড়ায়—সুর ক'রে বেশ উঁচু গলায়।

বোরা কালা সুজাত্তি
উলুবনে উৎপত্তি

ছায়া জলে ঘর
সম্ সম্ সম্।
মহাদেবের বর।।

কালিয়া নাগ
ধলিয়া নাগ

পথের ধারে গাড়া
চোখ রাঙাইলে,
পদ্মার বরে ভাঙবেক শিরদাঁড়া।
সয় সয় সয়।
মহাদেবের বর॥

জল স্থল অন্তরীক্ষ অন্ধকার। কালি লেপা পদ্মদীঘির এ কূল ও কূল। বুনো ঝাড়, হোগলা, হেউলি, মাদার গাছ, ময়না কাঁটার ঝোপ একাকার। নিঝুম জমিদার বাড়িটা। এই নিস্তব্ধতার বুক চিরে মন্ত্রের মূর্চ্ছনা যেন ঠিকরে পড়ে, ঝিলিক মেরে যেতে থাকে বিদ্যুতের মত চতুর্দিকে। বেদেনী যাদুমন্ত্রে যেন আকর্ষণ করে নিতে থাকে জনহীন প্রকৃতির প্রাণ।

বশীকরণের মন্ত্র না জিয়ন মন্ত্র আওড়াচ্ছে জংলি ভাষায় তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ফিরে আসে নতুন এক ক্ষুধা নিয়ে নয়ন। চোখে তার অপূর্ব প্রকাশ।

সে দেখে তার ময়নাদিদি যেন এক মনোমোহিনী হয়েছে! তার রাঙান শাড়িখানায় আরো যেন খুলেছে তার রূপ।

ক্রমে ময়না যেন মন্ত্রের ঝংকারে মনসার রূপ পরিগ্রহ করে। প্রভামণ্ডল যেন ঝলমল ক'রে ওঠে দিব্যশ্রীতে। পরিপূর্ণ সুগঠিত স্তনভার। নাসায় মণিময় নথ। হাতে শংখপদ্ম জীবন্ত নাগিনী। পদতলে দীর্ঘগ্রীব মরাল। লক্ষ লক্ষ নাগনাগিনী ছুটে এসে যেন লুটিয়ে নাচতে থাকে তার পায়ের তলে। লাল কালো হলুদ কত বিচিত্র পদ্ম তাদের ফণায়—কত অদ্ভুত চক্র তাদের গায়। ময়নার মন্ত্রের তালে তাল রেখে যেন নয়নও নাচছে।

না, না, নয়ন স্বপ্ন দেখছে।

গান থামে এক সময়।

নয়নের মনের কল্পিত পুরাণখানাও যেন বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে। ছবির মায়া যেন মিলিয়ে যায় নিমেষে।

ডাহুক ডাকছে ঐ বেত ঝাড়ে…

ঝিঁঝিঁরা সাড়া দিয়ে ওঠে চারপাশ থেকে।

শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শোল গজাল…

আইজ একটা মন্তর শিখাও বুইনদিদি।

কোথা ছিলিক বাঁন্দর ?

বাড়ি গেছিলাম, ফির আইছি। একটু মিথ্যা কথা বলে নয়ন।

আজ রেতে আর খেতে পারবিকনি। তুই জ্বালালি হামাকে।

না জ্বালাইলে তো তুমি বশ হইবা না। তুমি কি যে-সে বাইন্থার মাইয়া !

বশ করবার চাহিস কাকে রে বেকুপ ! কোঁচ দেখেছিস ?

আজ আর নয়ন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে কিম্বা চোখের শাসানিতে ভয় পায় না। সে বলে, কত দেখছি অমন কোঁচ, এক নালা ! তুমি ভয় দেখাও কারে, কে ডরায় তোমার চোখ রাঙানি ? বুইনদিদি আইজ একটা মন্তর শিখাও আমারে।

বসে থাক হামার বিছানায়। দিগ-রাত্তিরে মন্তর জাগবেক।

হাঁরে নয়ন, তুই খাবিকনে কিছু ?

আইজ আর খামু না।

ক্যান্ ?

ভরা পেটে মন্তর চলে না যে !

তুই দেখিন বুড়া ওঝা হইছিস্।

বেদেনী একটা পেঁপে ও কতকগুলো পানিফল বের করে ডোলা থেকে। একখানা দা আনে। ফলগুলো সুন্দর করে কেটেকুটে একটা পদ্মপাতায় করে পরিবেশন করে। খা।

উঁহুঁ।

হামরা খালি পেটে কেউকে এলেম শিখাবেক না।

কত ঢুঙ্ই যে জানো !

অগত্যা নয়ন হাত ধুয়ে আসে পদ্মদীঘির জল ছাড়িয়ে।

বাসাখানা নিতান্ত ছোট নয়। চালিটাও বেশ লম্বা চওড়া। একটা পরিবার থাকার উপযুক্ত। ময়না একটা ভিন্ন শয্যা বিছায়। পেঁপে গাছের আঁশ ও দড়ি দিয়ে চিকন করে একখানা মাদুর বুনেছে সে। সেইখানা নয়নের বিছানার জন্য যত্ন করে বিছিয়ে দেয়। ওখানা অতিথি অভ্যাগতদের জন্যই তোলা থাকে। নয়ন আজ আর তাঁতির পোও নয়, বাঁদরও নয়, সে সমাদরের প্রিয়জন।

নয়নকে শুতে ব'লে ময়না যথারীতি বিড়ি তৈরী করে। একটা দু'টো ক'রে অনেকগুলো।

নয়ন 'দিগ-রাত্তিরের' জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে।

আজ তিন দিন তিন রাত্তির।

কিসের বুইনদিদি?

ভৈরব গেছেক।

তুমি মন্তর শিখাবা না—যত আজে-বাজে কথা।

তুই কি মন্তর শিখবিক? সাপের, না আধি-ব্যাধি বেমারীর?

সাত কাণ্ড রামায়ণ পইড়া সীতা কার বাপ! সাপের মন্তর—সাপের বুইনদিদি।

আর হবেক নি লয়ন—ও নাম মুখে নিলে সেদিনটি মাটি।

নয়ন বোকার মত চেয়ে থাকে।

আসছে আঁধিয়ারে।...একটু কি ভেবে ময়না আবার বলে, নারে ব'শেখ জোঠে হবেক না—মাস খারাপ। শাওনা আষাঢ়েও মন্তর জল হয়ে যাবেক। আসছে ভাদাই মাসের কাল কুট্টি আঁধিয়ারে, মন্তর জাগবে আগুনের লাখান।

আমি চাই না শেখতে। নয়ন উঠতে চায়।

এখন যাবি ক্যামনে দিগ-রেতে—পাগলা বাছুর।

ময়না তাকে শক্ত হাতে ধ'রে শুইয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ পরে ময়না জিজ্ঞাসা করে, বংশীতলা ক' কোশ রে লয়ন?

ভাদাই মাসে কমু, দিগ-রাত্তিরে—পথ মাইপা।

ভোর হওয়ার অনেক আগেই ময়নার ঘুম ভেঙেছে। সে ঘুম থেকে উঠে আর নয়নকে দেখেনি। তবে ওটা রাত থাকতেই চলে গেছে। যাক, ভেবেছিল ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে সহজেই জেনে নিতে পারবে বংশীতলার পথ। ভোর বেলা পর্যন্তও কি আর ওর রাগ থাকবে ?

ময়না এখানে এসে অবধি আর তমালতলার বাইরে পা বাড়ায়নি। তবু তাকে আজ যেতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ভৈরবকে। শৈশবে সে সংগিনীদের সঙ্গে কত দেশ কত গ্রাম গাঁ ঘুরেছে—আজ সে পারবে না কেন ? নিশ্চয় পারবে একা একা যেতে। পথ সে চেনে না—তাতে হয়েছে কি ? না হয় একটু ঘুরবে। হয়তো সংগী জুটবে, নইলে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে যাবে। তার পূর্বপুরুষেরা ছিল আরব বেদুইন—তারপর এল হিন্দুস্থানে—এখন তাদের বসতি পূর্ব বাঙলায়। মরু মালভূমি পাড়ি দিয়ে তারা যদি আসতে পেরে থাকে অথৈ জলের কিনারায় সে কেন পারবে না ভৈরবের কাছে যেতে ?

আজ সে সকাল সকাল বঁড়শি তোলে। গোটা কয়েক মাছ কুটে রাখে।

তারপর প্রণাম করে মনসার ঝাঁপি নামায়। ডালা খোলা মাত্র দু'টো গোখ্‌রো সাপ ফোঁস ফোঁস করে ফণা ধরে খাড়া হয়। সাপ দু'টোকে দু'টো হাঁড়ির মধ্যে পুরে মাছগুলো খেতে দিয়ে সে চারটি পান্তা নিয়ে বসে। কখন ফিরবে তার তো ঠিক নেই। সাঁঝও হতে পারে, রাত হওয়াও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু খেতে সে পারে না। মনে তার ত্রাস—বেলা বেড়ে গেল বুঝি।

খাওয়ার চেয়ে বেশবিন্যাসে সময় একটু বেশী কাটায়। চুল আঁচড়ায় নিপুণ হাতে। খোঁপা বাঁধে উঁচু ক'রে। তারপর পরে গেরুয়া শাড়ি। কালো চোখে

সুন্দর করে সুর্মা টানে। তারপর সাপের ঝাঁপি জরি-বুটি নিয়ে পথে নামে।

হেলে দুলে সর্পিল পথে চলেছে বেদেনী। সিমুলতলা ডাইনে রেখে বাঁয়ে ঘোরে আন্দাজে। কত গৃহস্থ বাড়ির সিমের মাচা, লাউর ঝাঁকা নুয়ে নুয়ে যে সে এড়িয়ে চলে। কখনও বা গাঁয়ের ছেলে কিম্বা বুড়োদের কাছে জেনে নেয় বংশীলতার সোজা রাস্তা। পথ বেশি নয়, ক্রোশ আড়াই, কিন্তু ছোট বড় খাল আছে পাঁচটা। একটাতে সাঁকো আছে, আর কটা পার হ'তে হবে যাতায়াতের নায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে খাল পাড়ে কে জানে। কত লোক যে ময়নাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তার ইয়ত্তা নেই। একজন তো জোর করেই তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে পান তামাক খাইয়ে দেয়। যাওয়ার সময় বলে ফেরার পথে সে যেন তার রুগ্ন স্ত্রীকে একটু দেখে যায়। পারিশ্রমিক সে কম দেবেনা—তবে ওষুধ একটু ভাল হওয়া চাই।

একদল ছেলে একটা ছৈলাতলায় খেলছে ছি-বুড়ি! বায়না ধরে, বেদেদিদি সাপখেলা দেখব। কি সাপ? গোখরো না দুধরাজ—না পদ্মদাঁড়াস্? এমন ক'রে ছেলের দল তার পথ আগলে দাঁড়ায় যে ময়না আর এড়াতে পারে না।

একটু পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েছে ময়না। সে একটা পরিষ্কার সুপারি তলায় বসে। নিকটেই কয়েকটা ফলন্ত নারকেল গাছ। ময়না মুখ তুলে চাইতেই ছেলেরা তার মনের কথা বোঝে। একজন তাড়াতাড়ি দু'টো কচি ডাব পেড়ে নিয়ে আসে আর একজন ছোটে দা আনতে।

ময়না তুবড়ি বাজাতে থাকে।

ফণা ধ'রে ফোঁস ফোঁস ক'রে ওঠে গোখরো দু'টো। হিলবিল করছে জিভ!

ছেলের দলে ভাঙন লাগে—তারা অনেক দূরে গিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাঁয়ের বুড়োরাও আসে, বৌ-ঝিরাও বাদ যায় না। কেউ ধান ভানা ফেলে, কেউ বা কোলের ছেলেকে মাই দিতে দিতেই ছোটে।

একটা সাড়া পড়ে যায় বেদেনীর বাঁশির আওয়াজে।

ময়না দু-একজনকে দু-একটা জরি-বুটিও না দিয়ে পারে না। তার দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এদের অনুনয়ও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

ফির আসবেক হামি ভাল ভাল দাওয়াই লিয়ে—আজ চলি বহিন গো, চাচাজী।

ময়না ডাব খেয়ে পানের রসে মুখ রাঙিয়ে ফের পথে নামে। এবার তার আর অসুবিধা হয় না। কয়েকটি ছেলে আসে খাল পার করে ভাল রাস্তায় তুলে দিতে।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবে তুমি, বংশীতলা—কার বাড়ি ?

ময়না থতমত খায়। কার বাড়ি তাইতো ! এক সাধুর বাড়ি।

রোগী আছে বুঝি ? কার অসুখ ?

সাধুর।

সাধু সন্ন্যাসীর আবার অসুখ হয় নাকি ?

হবেক না ক্যান্ ? বড় শক্ত বেমারী ভাই ! বলতে বলতে একখানা নৌকায় চড়ে ময়না একটা খাল পার হয়। ছোট্ট খাল ঝির ঝিরে সোঁত।

আবার হাঁটতে থাকে ময়না। এখন আর লোকজনের অভাব হয় না। প্রত্যেক গাঁয়েই কত ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে তার পিছন পিছন চলতে থাকে।

একদল যায়, ফের আর একদল আসে।

দুপুরের পর বংশীতলায় এসে থামে ময়না।

একটা ঘুঘুর একটানা শব্দে চারদিকের নীরবতা ভাঙছে। মাথার ঝাঁপি নামিয়ে ময়না একটা বট গাছের তলায় বসে। ঘর্মাক্ত মুখখানা মোছে আঁচল দিয়ে। বড় কড়া রোদে আধক্রোশটাক মেঠো পথ ভেঙে এসেছে। চৌচির হয়ে ফেটে গেছে মাঠ।

স্থানে স্থানে তার পা দু'খানা ছড়ে গেছে। অনেক দিন তো এসব অভ্যাস নেই তার। সে ঘরের বৌ হয়ে গিয়েছিল।

আজ আবার পথে বের হ'তে হয়েছে!

একদল রাখাল ছেলে খেলা ফেলে ছুটে আসে।

ভৈরবকে তোরা চিনিস ভাই? বৈরাগী গোঁসাই।

ভৈরবকে তারা সঠিক চেনে না, কিন্তু এখানে যে এক ঘর বৈষ্ণব আছে, তার খোঁজ রাখে। কলা বাগানের পাশ দিয়ে এই মাত্র সে যে সাঁকোটা পার হয়ে এই গাঁয়ে ঢুকেছে—তার পূব দিক দিয়েই ঘন সুপারি বাগ। তার মাঝখানের বাড়িটা।

ময়না আর বিশ্রাম করতে পারে না। এত কাছে এসে সে বসে রয়েছে! তার চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ওঠে। সে উঠে দাঁড়ায় দুরু দুরু বুকে।

[নয়]

ভৈরবকে ডাকছ কে?

হামি এক বেদিনী।

কেন?

কি জবাব দেবে ময়না? একটু ভেবে সে বলে, তার নাকি বেমারী?

কই না তো।

দু'খানি ছনের ছাওয়া পনরর বন্দ চৌ-চালা ঘর। দিব্যি ঝকঝক করছে মাঝখানের উঠানটি। উঠানের ওপর একটা ঝাঁকড়া তুলসী গাছ। দু'পাশে বকুল ও শেফালী গাছ গোটা তিনেক। শান্ত পরিবেশ। মুখোমুখি ঘর দু'খানা।

উত্তরের ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে—বছর কুড়ি বয়স। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। বিধবা কি সধবা ঠিক বোঝে না ময়না। কিন্তু তার মাথাটা একবার রিমঝিম করে ওঠে রূপ দেখে।

এ মেয়েটি কে? এবং ভৈরবেরই বা হয় কি?

কে রে শ্যামলী ? দক্ষিণের ঘর থেকে প্রশ্ন হয় এবার।

উত্তরের থেকে জবাব আসে, একজন বেদেনী।

কাকে চায় ?

ভৈরবকে ?

কেন ?

বোধ হয় সাপের খেলা দেখাবে !

আঃ মর, খালি ঠাট্টা !

দক্ষিণের ঘরখানার দুয়ার ঠেলে শ্যামলীর প্রায় সমবয়সী একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। সে ময়নাকে একখানা আসন দেয় বসতে। বস, বস, বেদে-বোন।

ময়নার মুখচোখ আবারও ঝাঁ ঝা করে ওঠে। সে বসতে চায় না। এতক্ষণ রোদে পুড়ে তার যতটা অস্থির হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সে অস্থির হয়ে পড়ে বাড়ির আবডালে গাছ পালার ছায়ায় এসে।

প্রথম ছিল একটি। এখন জুটেছে দু'টি। এরা যে কত কি প্রশ্ন করবে তার উত্তর দিতে পারবে না ময়না। তাকে একেবারে নাজেহাল ক'রে ছাড়বে।

চলি বহিন—বেইল শেষ পহর। অনেক দূর যাবেক। বসবেক না।

কেন সাপের খেলা দেখাবে না সাধুকে ?

না—অনেক পথ যাবেক।

কত দূর যাবে ?

তমালতলা।

অত দূর থেকে এসেছ রোগীর খোঁজে ? তোমার তো বড় মায়া বৈদ্যদিদি। শ্যামলী মুখ টিপে হাসে। আবার কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে ময়নার। তাড়াতাড়ি বাড়ির বাইরে চলে আসে সে।

অনেক রাত্রে পাঁচ পাঁচটা খাল পার হয়ে সে যখন পদ্মদীঘির কিনারায়

এসে পড়ে তখন শুনতে পায় কে যেন তার বাসায় ব'সে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে।

ময়নার শ্রান্ত দেহ একবার শিউরে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে জোর পায় এগিয়ে চলে।

কে?

আমি ভৈরব।

ময়নার দেহমন আনন্দ-ব্যাকুল! সে আর কিছু বলতে পারে না।

[দশ]

ময়নার ওপর রাগ ক'রে নয়ন যা করে তাতে ক্ষতি হয় বেচারি গোপীমামার। সে সারা সকালটা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কুমোর-বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ বসে তামাক খায়। চাক ঘুরায় পছন্দ মতো। হাঁড়ি পাতিল বাসন সে তো আর গড়তে জানে না—গড়ে একটা অদ্ভুত জিনিস। আহাহা করে ছুটে আসে রমেশের মা। অমন চাকের নরম মাটিগুলো নষ্ট করছে নয়ন।

সে কুমোর-বাড়ি থেকে উঠে পড়ে।

শানদার-বাড়ি গিয়ে আবার তামাক পোড়ায়।

দেও না আমি সুর কইরা দি ঢাকে, তারিণী খুড়া। তুমি তো শক্ত কইরা টানতে পার না দোয়াল।

নে—দেখুম তোর বাহাদুরী।

বাড়ির কাছে বাড়ি। সর্বদা যাতায়াত। এ ছাড়া পূজা পৈতা রাস দোলে তো মেলামেশা আছেই। ঢাকের দোয়াল টেনে কেমন ক'রে সুর বাঁধতে

হয় তা নয়ন জানে। ছোট খাটো ঢোল তো সে নিজেই ছাইতে পারে। একখানা পাতলা পাঁঠার চামড়া হ'লে আর বিশেষ একটা লাগেই বা কি! দরকার হলে মৃদংগও বোধ হয় সে ছাইতে পারে। মোলায়েম হাতে সে মিষ্টি সুরও বাঁধতে পারে। কেমন যেন ছোটকাল থেকেই গান বাজনার দিকে ওর মস্ত ঝোঁক। কত দূর দেশে নানা উৎসবে গিয়ে ও পাল্লা দিয়ে কীর্তন গেয়ে তমালতলার নাম রেখে এসেছে। ওর মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে একটা কীর্তনের দল খুলতে। বসে বসে তাঁত ঠেলে ঠেলে পায়ের গাঁটে যেন বাত ধরে গেল। তার ওপর আবার গোপীমামার যে মিষ্টি কবির ছড়া!

জন্মের পর গোপীমামার মা নিশ্চয় ওর মুখে মধুর বদলে এক ঝিনুক নিমের রস দিয়েছিল।

নয়ন কাজ করে, তারিণী বাহবা দেয়। যা ভাবছিলাম তা নয়—ক্ষেমতা আছে।

প্রায় এক দুপুর বসে নয়ন বেগার দেয়। ইতিমধ্যে তারিণী তার গৃহস্থালির কাজ কর্ম সারে। গরু বাঁধে, পোয়াল কাটে, বাঁখারি চাঁছে—আরও কত কি!

ঢাক সারা হ'লে নয়ন এক হাত বরণ বাদ্য বাজায়। তারিণী খুশী হয় খুব। সে এক ছিলিম তামাক খাইয়ে নয়নকে বিদায় দেয়।

নয়নের তখন ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু বাড়ির দিকে গিয়ে করবে কি? সেখানে গেলে তো একটা কুরুক্ষেত্র অনিবার্য।

এমন সময় গোপীমামা এসে হাজির।

নয়ন কোথায়?

এতক্ষণ তো এখানে বইসা আমার একটা ঢাকের দফা নিকাশ করছে—এখন গেছে নাকি বাড়ির দিকে। তুমি ওরে একটু শাসনও করতে পার না?

কিছু কইলে আমারে কুইথা আসে তারিণী, আমারে কুইথা আসে।

আসবেই তো। তুমি যে এতটুক কাল থিকা আহার যোগাইয়া এত বড়ডা করছ!

আমি কি ওর পেত্যাশা করি তারিণী। যম জামাই ভাইগ্না কেও না আপনা। বলি যে বয়সের কালে খাটাইয়া পিটাইয়া কিছু কিছু কইরা জমাইয়া আমার হাতে দে। আমার জানা শুনা একটা মাইয়া আইনা দি। পূবের ভিটাডা পইরা আছে, একখান ঘর তোল, সুখে শান্তিতে থাক। আইজ পর্যন্ত যা কামাই করল, হিসাব করইয়া দেখলাম তাতে একটা প্যাটই চলে না।

আরে তুমি না থাকলে ও মরত উপাস কইরা। বাউণ্ডুলিয়া ভূত।

যাউক ও সব কথা। তুমি একটু দুধ দিতে পারো—শীতলারে নিবেদন করুম।

তারিণী শানদারের বৌ ঘোমটার আড়াল থেকে খনখনে গলায় বলে, একটু আগে আইলে কি আর দুধের লাইগা ভাবতে হইত! সবটুক খাইয়া ফেলাইছে বাছুরে।

অথচ তখনও বাছুরটা বাঁধা। দুধ দোয়ানো হয়নি।

কথাটা তেমন খাপ খেলো না ব'লে তারিণীও লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। আচ্ছা কাইল, কাইল আইও মামা।

গোপী আর আসবে না, কারণ এই তিন দিন সে ফিরছে।

পদ্মদীঘির যে পাড়ে চর পড়েছে তার একটা কোণে খানিকটা স্থান জুড়ে ট্যাপা পানা ও জলো ঘাস। তার ভিতর ফাঁক ক'রে ক'রে তিনটা ছিপ ফেলেছে নয়ন। শানদার বাড়ি থেকে সেই যে না খেয়ে বেরিয়েছে আর বাড়ি মুখো হয়নি। কার কাছ থেকে যেন ছিপ ক'টা চেয়ে নিয়ে শিকারী বকের মতো বসে রয়েছে ফাতনার দিকে চেয়ে। একটা গরু আসে জিভ বের করে নয়নকে চাটতে। নয়ন তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করে। গোটা দু'য়েক লাল ফড়িং ফাতনা লক্ষ্য ক'রে উড়তে থাকে—সেগুলোকে ঢিল মেরে সে তাড়ায়। চারদিকে মাছ নাচছে কিন্তু ভুল করেও এমন সাধা-আহার কেউ গিলছে না। নয়ন রাগ ক'রে উঠে দাঁড়ায়। বাগানের ভিতর গিয়ে কয়েকটা ডাঁশা আম পেড়ে এনে নির্বিকার চিত্তে চিবুতে থাকে।

আঁটিগুলো ছুঁড়ে মারে ময়নার বাসার দিকে। কিন্তু অতদূর যাবে কেন হাল্কা আমের আঁটি ?

সন্ধ্যাবেলা গোটা কয়েক কৈ মাছ ওঠে—কয়েকটা মাগুর মাছও পায় নয়ন। আর কাতলা দেখা যায় না। গরু বাছুর নেই পদ্মদীঘির পাড়ে। ওপাড়ার মেয়েরা জল নিতে এসেছিল, অনেকক্ষণ চলে গেছে। সূর্যটা ডুবে গেছে জমিদার বাড়ির আবডালে। শুধু উঁচু উঁচু তাল গাছের মাথায় একটু একটু ঝিকমিক করছে লাল আলো। জোড়া দু'য়েক ডাহুক বের হয়ে আসে বুনো মুরগীর সঙ্গে। আবার নয়নকে দেখে তারা গা ঢাকা দেয় ঝোপে ঝাড়ে।

নয়ন ওঠে। কিন্তু মাছ নিয়ে সে কোথায় যাবে ? বেদেনীর বাসার দিকে সে হাঁটে। কিন্তু সে বাসাও তো খোলা নেই। গেল কোথায় ময়নাদিদি ? নয়ন একটু বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ময়নাদিদি তো বাসা ছেড়ে কোথাও যায় না।

এমন সময় ভৈরব আসে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ময়না ফেরেনি বংশীতলা থেকে।

নয়ন বলতে পারিস ময়না কোথায় গেছে ?

ময়না তোমার উইরা গেছে—আমি তার জানি কি !

বড় রাগ রাগ দেখি যে !

রাগ কি হয় সাধে ?

রাগের হেতুটা কি নয়ন ? ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে নাকি তোর বেদেদিদির সঙ্গে ?

না।

তবে ?

বংশীতলা যাইবে, একবার যেন পথের কথা জিগাইল—আমি কি জানি কইলাম ঝোকের মাথায়—আর সাড়া শব্দ নাই, একা একাই বুঝি গেছে বংশীতলা তোমার খোঁজে।

আমার খোঁজে ! কেন নয়ন ? আমি তো সময় মত আসবই।

সে কথা বোঝে কই ? সব কাজেই ছটফটানি !

ভৈরব একটু হাসে। তারপর একতারাটায় সুর বেঁধে ধীরে ধীরে গান ধরে।

নয়ন চুপটি ক'রে অন্ধকারেই ভৈরবের অজ্ঞাতে বাসার এক পাশে চালির উপর বসে থাকে।

ভৈরব গান গায়, কিন্তু নয়নের তাতে মন বসে না। এত দেরী হচ্ছে কেন তার বেদেদিদির ? পথ ভুল ক'রে ঘুরছে নাকি অন্ধকারে ? না ভয় পেয়েছে আঁধারমণির ছাড়া মাঠে পা বাড়িয়ে ? কিছুই সে ঠিক করতে পারে না।

সারা দিনের উপবাসে এবং ময়নার জন্য উৎকণ্ঠায় নয়নের শরীর এলিয়ে আসে। সে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাতি জ্বালিয়ে ময়না আশ্চর্য হয়ে যায়।

তোর মুখটি যে শুকনা ভাই ?

এতক্ষণ বাদে নয়নের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

ময়নাও অধীর হয়ে পড়ে। কারণ তার ভাগ্যে জুটেছে—একটা সাধু আর একটা পাগল।

ভৈরব কিছু বলে না।

ময়নাও কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। সে ক্ষুধার্ত পাগলটার জন্য কোন ফলমূল ডোলায় আছে কিনা তাই খুঁজতে থাকে।

আবার বুঝ-প্রবোধ দিয়ে ময়না নয়নকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। গোপীমামার তাঁত দু'খানা আবার নিয়ম মতো চল্‌ছে। মাকু দু'টো যেন জীবন্ত হয়ে ছুট্‌ছে—ঠকাস্ ঠক্। সঙ্গে সঙ্গে গোপী মামাও খেউড় খিস্তি ভুলে গেছে। এখন তাকে দেখে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব'লেই মনে হয়। বাস্তব দর্শন সম্বন্ধে কত রকম সে উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছে নয়ন এবং তার বেহিসাবী মামীকে! এক পোয়া তেল দিয়ে মাস চালানও যা, আধ পোয়া দিয়েও তাই। কারণ এক পোয়া হলেও আর তেলে-ঝোলে খাওয়া যায় না—ত্রিশ দিন, ষাট বেলা। অতএব আধপোয়ায় দোষ কি? প্রতি মাসে ছ'টা পয়সা বাঁচল। বছরের শেষে হিসাব করে দেখ একটাকা দু'আনা এবং সেই একটাকা দু'আনার সুতো খরিদ করে যদি সপ্তাহে একখানা কাপড়ও বেশি বোনা যায় তবে নিদেন পক্ষে বারটা টাকা মুনাফা বাড়ে বছর ফিরলে। একেই বলে সংসারী—অর্থাৎ সংসার, মানে যেখানে সঙ্‌ই সার। তারা, তারা—মাগো! নয়ন, একটু জিরাইয়া নে সোনা—একটু তামাক সাজ না···

গোপীমামা তামাকে মাত্র একটি কি দু'টি টান দিয়েছে এমন সময় কি যে হয়—সে 'নয়ন', এই মাত্র উচ্চারণ ক'রে হুঁকোটা ফেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের মাচায় ওঠে।

মামা কোথায় নয়ন?

জানি না তো।

এই মাত্তর যে তামাক খাইতে দেখলাম।

তামাক খাইতে? ভুল দেখছ হালদারের পো। ভুল দেখছ। কাইল যে মামা বিষ্টাপাড়া গেছে, এখনও আয় নাই।

তবে তামাক খাইল কে?

আমি।

আমার লগে মসকরা করো না কি নয়ন—স্বচক্ষে দেখলাম যে মামারে।

বুড়া হইছ, অমন আরও কত দেখবা!

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে মামী আরও গোল পাকায়। নয়ন তোর মামারে পাঠাইয়া দে—চাউলের মাপটা দেইখা যাউক।

এখানে মামায় কই মামী?

কানাই হালদার বলে, কিরে নয়ন মসকরা করো না ব'লে? তোর মামীরও কি ভিমরতি হইছে?

কেডা? কানাই ভাইগ্না? আমি ভাবছিলাম্ বুঝি— বলে মামী সোয়া আট ইঞ্চি জিভ বার ক'রে দাঁতে কেটে মাথার ঘোমটাটা একটু বেশি ক'রে টেনে দেয়।

নয়ন বলে, তুমি ভাবছিলা মামায় আইছে বুঝি?

হয় হয়—মামা ভাইগ্নার গলা তো আর চেনার জো নাই—প্রায় একরকম।

গোপী মাচায় বসে অন্ধকারে দম নেয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মশায় তাকে বেদম করে তোলে।

তয় একটু অপেক্ষা কইরা দেখি। ব'লে কানাই হালদার কল্কিটা হুঁকোর মাথা থেকে নিয়ে টানতে থাকে। পয়সা দুই আনা তো আর আইজ-গো পাওনা না—পেরায় এক বচ্ছর হইল। সাইধা গাঁইটের পয়সা দিয়া আইনা দিয়া দায় ঠেক্‌লাম আমি? হাটতে হাটতে আমার রস মইরা গেল।

অত কও ক্যান্—দেখা হইলেই দিয়া দেবে।

সেই দেখাই তো মেলে না।

ক্যান্, মামায় তো বাড়ি ছাইড়া যায় না কখনও।

তয় বাড়ি আছে নাকি—সত্য ক' আর ঘুরাইস না নয়ন? আমার ঘরে একটুও লবণ নাই। পেরায় একমাস হাটে যাই না—যামু কি লইয়া,

ঘরে তো বাড়ন্ত ধান-চাউল নাই। আছে কয়েকটা গাছে নারকেল, তাও ঝুনা হয় নাই! আইজ আলুনীই খাওয়া লাগবে।

সত্যই মামায় বাড়ি নাই—তুমি পেত্যয় করো, মিছা কমু ক্যান্? কাইল হঠাৎ গেছে দিদির ব্যামো শুইনা।

তয় সন্ধ্যা পর্যন্ত বইয়া দেখি যদি আয়। আমার বিষম ঠেকা ভাইডি।

ঘটনাটা প্রায় এক বছর পূর্বেই বর্ষাকালে ঘটেছিল। আষাঢ় মাসে কানাই গিয়েছিল হাটে। সেদিন অনেক নারকেল বেচেছে। হাতেও যেমন পয়সা আছে, হাটেও তেমনি মাছ উঠেছে। ইয়া বড় বড় ইলিশ, কিন্তু দাম নিতান্ত সস্তা। কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে কানাই একটা মাছ কিনে আনল। আর একটা আনল হাত সাফাই ক'রে। বাড়ির কাছে এসে ভাবল এতবড় মাছ দু'টো দিয়ে সে করবে কি? গোপী তো বড় একটা হাটে যায় না—তার কাছে একটা বেচে যাবে।

তোমার লাইগা আনছি, বড় সস্তা।

কত?

তিন আনা। বিশ্বাস না করো জিগাইয়া দেখো অর্জুন শীলের কাছে।

আর জিগামু কি!, এত বড় মাছটা কি আর মাগ্না দেবে?

মামা এক আনা পয়সা বার ক'রে কানাইর হাতে দিয়ে বলে, আর দুই আনা এখন হাতে নাই, পরে নিও।

আচ্ছা, আচ্ছা, যখন খুশি দিও।

রাত্রে খেতে বসে গোপী মাছ মুখে দিয়ে বোঝে যে কেন কানাই এত আগ্রহ ক'রে তাকে বাকী পয়সায় একটা গোটা ইলিশই গছিয়ে দিয়ে গেছে।

মাছটা একেবারে গোবর পচা।

আচ্ছা—গোপীর সংগে চালাকি! সে আর একটি আধলাও ছোঁয়াচ্ছে না। এমনিতেই সে মাছ কেনে বিস্তর! যদিও বা কিনল তাও হল নিষ্ফল! অবশ্য

একেবারে নিষ্ফল হ'তে দেওয়ার পাত্র গোপী নয়। সে নাক চোক বুঁজে নগদ পয়সা উসুল ক'রে খেয়ে—অন্তের ভরসায় রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

গোপীকে মশায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। পরনের জাল কাপড় ভেদ ক'রে পাছার পেশী একেবারে জর্জরিত করে দিচ্ছে। সে হাত না চালিয়ে পারে না।

ও কিসের শব্দ মাচায়? কানাই প্রশ্ন করে।

গোপী হাত থামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে থাকে।

একটা লাঠি নিয়ে মুখে একটা অব্যক্ত শব্দ করে মাচার ওপরের বিড়ালটাকে তাড়াতে আসে মামী। মুখ পোড়া হোলাটার জ্বালায় মরলাম। নিত্যি নিত্যি ইন্দুর ধরতে গিয়া হাঁড়ি পাতিল ভাঙে।

অবশেষে ভর সন্ধ্যায় ক্ষুণ্ণ মনে কানাই ওঠে। আমারে ঠগাইলে ঈশ্বর সইবে না। বাইরে বার হয়ে সে সত্য সত্যই আকুলকণ্ঠে বলে, এখন ক' তো নয়ন যাই ক্যামনে? কিছুই তো ঠাহর পাই না।

নয়ন তাঁত বন্ধ করে কানাইর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে।

কি করি বল তো?

আর করবা কি! তুমি একটু দাঁড়াও আমি আসি।

অল্প সময় বাদেই নয়ন ফিরে আসে। এক মোচা লবণ কানাইর হাতে দিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে যায়।

ভগমান তোর মঙ্গল করুক।

বাড়ি ফিরে নয়ন বলে, ধন্য মামা! দুই আনা পয়সার জন্য তুমি এমনও কর্‌লা!

কি কর্‌লাম? ওকি পাইবে নাকি কিছু? আমি কি জানি না, সবই শুনছি হাটুরিয়াগো কাছে। পচা মাছ চুরি কইরা আনছে, তার আবার দাম কি? জাইনা শুইনা চোরেরে আস্কারা দিমু?

তয় সামনা-সামনি কইলেই পার?

কেডা ভ্যাজাল করে। জান তো না, ওর মুখটা পাশ করা। দেখতে মিন্ মিন্ করে ভিজা বিড়ালের মত, কিন্তু যখন সুবচন ছাড়ে—

তোমারেও ফেল ক্যালায়!

নয়ন বিস্ময়ের ভান করে।

তুই তো আমার কিছুই ভালো দেখিস না—মরলে টের পাবি।

থাউক, বাজে কথায় কাম নাই। মামী আমার চাউলগুণ দাও, ভাত চড়াই।

একত্তর খাইলেই পারো।

নয়ন গম্ভীর ভাবে বলে, এখন না, তুমি মরলে মামা।

নয়ন, জিনিস চিনলি না। তুইও অন্ধ, তোর মামীও অন্ধ।

কি চিনলাম না মামা?

গোপী আর কোন জবাব দেয় না। নয়নকে সে আর কি বলবে! তার মত পরশপাথরের সঙ্গে এত দীর্ঘ দিনের পরিচয়েও এমন যে তার স্ত্রী তারই তো কোনো পরিবর্তন হলো না।

অন্ধকারে গোপী উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সেদিন প্রায় মাঝ রাত্রে গোপী কাশতে কাশতে বিছানা ছেড়ে ওঠে। মামী এবং নয়ন ঘুমে অচৈতন্য। মামার ঘুম ভেঙেছে একটা স্বপ্ন দেখে। সে যেন হাট থেকে নাও বোঝাই ধান কিনে এনেছে। নয়ন বাড়ি নেই—তার মামী একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছে। একটা জন-মজুরও পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির কাছের যারা, তারা আড় চোখে চাইছে। এখন কি করে গোপী? এমন সময় দমকা ঝড় ওঠে, নাওটা একটা ঘুরপাক খেয়ে মাঝ খালে গিয়ে পড়ে। গোপী ছুটে যায়, ধর ধর—কিন্তু সে ধরতে পারে না নাও।

ঘুম ভেঙে সে চেয়ে দেখে যে তার হাতের মুঠোয় নৌকার দড়ি নেই। আছে মশারির একটা অংশ। নাড়া লাগতেই মশা ভ্যান ভ্যান করে ওঠে।

বাতি জালিয়ে সে দেখে যে তাঁতী বাড়ির এমন কোন রংয়ের কাপড়

নেই যার টুকরা বাদ গেছে মশারির অংগ থেকে। তালির ওপর তালি। সাদা থানের মশারি, এখন হয়েছে ইরাণী বেদে-মাঝির নৌকার পালের মতো।

জঞ্জাল—তবু মেরামত ক'রে চালাতে হচ্ছে।

এই তো গরিবের গৃহস্থালি—পাঁজরে পাঁজরে নিপুন রিপু ও লক্ষ লক্ষ তালি। এসব দিকে নয়নের মামীর নজর নেই। সবই করতে হয়েছে গোপীকে। নইলে আজ আরামে আর ঘুমাতে পারত না শালী। সাধে আর মুখে গালাগাল আসে! আসে অনেক দুঃখে। সে মশারির একটা কোণ ইচ্ছা করেই তুলে রাখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মামী উঠে বসে। মশা তো না যেন ভীমরুল!

তোমার রোজ রাত্রিরে হয় কি কও তো?

আরে একটা পরামর্শ আছে—ডাকো তো একটু নয়নকে।

চুলায় যাউক তোমার পরামর্শ, দিনের বেলা কইয়ো—এখন আমি ডাকতে পারুম না ছ্যামরারে।

একটা ভাল কথা, বিশেষ গুহ্য—আবার কেউ যদি টের পায়।

যা তা সকার-বকার কইর না—আমি ভালবাসি না ওই সব কথা—গুহ্য!

আঃ! কি যে সব মুখ খুর পাল্লায় পড়ছি।

মুথ্‌খ, মুথ্‌খ তোমার চৌদ্দ গুষ্টি। আমার বাপে কখনো তাঁত ঠেলে নাই, চিরদিন পণ্ডিতিই কইরা গেছে।

আরে, সে সব রাখো। বিঘা সাতেক ধানী জমি পাইছি।

মামি আবার শুয়ে পড়েছিল—এবার সটান উঠে বসে। কোথায়?

নয়নরে ডাকো—না হইলে আবার কমু?

মামী অনেক কষ্টে নয়নকে ডেকে আনে। তোর মামায় নাকি সাত বিঘা জমি পাইছে।

কোথায় মামা?

তোর ময়নাদিদির চরগুলা বর্গা আনতে পারো ?

তারপর ?

গরু বাছুর পালা লাগবে না। জমিগুলা ঠিকা ধানে সাজাইয়া লমু জাবেদালীরে দিয়া। তারপর তুই একজন মজুর লইয়া বীজ দিয়া রুইয়া ফেলাবি। তোর আর তাঁত ঠেলা লাগবে না এ জম্মে। ধান দিয়াই মানুষ হইতে পারবি। তোর চিন্তায় তো আমার চৌক্ষে ঘুম নাই, নয়ন। এতকাল তো তাঁত ঠেইলা দেখলি। ক' কাইল যাবি তো আমারে লইয়া ?

মামী বলে, সোনাডা তোরে তোর মামায় কি কম ভালবাসে ! তোর মামায় জ্ঞেয়ানের সমুদ্দুর—আমি তুই তার তলার খবর পামু ক্যামনে ?···তোর মশারিডা ছেঁড়ছে, কাইলই একটা তালি দিয়া দিমু। তোর বড় কষ্ট হয় ঘুমাইতে, সবই তো বুঝি, সময় পাই কই !

আচ্ছা, কাইল যাইয়া দেখমু।

ওরে, একলা যাইস নারে মণি—তোর মামারে সঙ্গে লইয়া যাইস।

হয় হয়, বুঝছি।

নয়ন উঠে যায় বিরক্ত হয়ে।

গোপী সস্নেহে বলে, ছ্যামরাডা বড় ঘুমে কাতর।

মামী বলে, আহা ওর বয়েসটাই বা কী !

তারপর বাতি নিবিয়ে দু'জনে একটু ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে শুয়ে থাকে।

সকাল বেলা মামীই আজ শয্যা ত্যাগ করে সকলের আগে। নয়নকে ডেকে তোলে। গোপীকে তামাক সেজে দেয়।

গোপী যাবে এইটুকু পথ একান্ত চেনা জায়গায়, কিন্তু রীতিমত বরসজ্জা করে। তেল জল দিয়ে সিঁথিটি আঁচড়ায়। বহু যত্নে তুলে রাখা ঠাকুর্দার নক্সি পাঞ্জাবীটা গায় দেয়। মামী আঁচল দিয়ে ধুলা পরিষ্কার করতে থাকে।

আঃ, থাউক, থাউক, অত লাগবে কিসে—যামু তো পদ্মদীঘির পাড়ে।

তাতে হইছে কি ! এ তো আর গরু বাঁধতে যাও না।

কথার মত একটা কথা কইছ। নয়ন, আমার গামছাখানাই কান্ধে লইয়া চল। তুইতো হামেসা যাও-আও।

দীঘির পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় মামার লুব্ধ চাহনি চরের ওপর গিয়ে পড়ে। কার যেন একটা গরু চরছিল, সে ব্যস্ত হয়ে তাড়িয়ে দিয়ে আসে। সর্বনাশ করল ঘাসগুলা খাইয়া। ঘাস বেইচাও পাঁচ টাকা পাওয়া যাইবে। বীজ ধানের খরচ ওতেই হইবে। নয়ন আমার লাঠিডা লইয়া একটু দেইখা আয় চরের মাটি কেমন শক্ত হইছে! বন্যা আর হিজল গাছ কয়ডা কাটলে বাহারিয়া জমি হইবে—কি কও? এটুকু রুইতে পারবি না? না হয় আমিও থাকমু সঙ্গে সঙ্গে।

নয়ন চুপ করে হাঁটে।

কিরে চুপ কইরা রইলি যে? লজ্জা করে নাকি? তোর বাপে কিন্তু নবাব আছিল না – আমি তো চিনি সম্বন্ধীরে।

গোপী একটু পরিহাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ওরা ময়নার বাসার কাছে এসে পড়েছে, ময়নাও প্রায় বাসার ঝাপ ঠেলে বেরিয়েছে।

মামা, তোমার পিঠে কাদা।

কও কি!

গরুর ল্যাজের বাড়ি—টের পাও নাই?

তাড়াতাড়ি গোপী জামাটা খুলে দলা পাকিয়ে বগলদাবা করে।

কিরে নয়ন? ময়না সম্বোধন করে।

গোপী এগিয়ে এসে আদাব দেয়।

ময়না যায় অবাক হয়ে।

জমি বর্গা চায়—পদ্মদীঘির ঐ চরটা—নয়ন বুঝিয়ে বলে।

ওটায় কি হবেক?

ধান।

ময়নার বিশ্বাসই হয় না। অত ঘাস জংগল বন-বাদারে জন্মাবে ফসল! কে কাটবে ঐ মোটা মোটা বন্ধা আর হিজল গাছ? যদি হয় ভালই। নয়ন তো তার পর না।

ময়না মত্ দেয়। গোপী আবার আদাব দিয়ে পদ্মদীঘির উঁচু পাড়ে উঠে জামাটা গায় দিয়ে হাঁটে।

বাড়ি ফিরে সে জামাটা খুলে মামীর হাতে দেয়।

একি! মাইর-ধইর করল কে?

মারবে কেডা? ময়না একটু মসকরা করছে।

কাম হইছে তো?

হবে না? গেছে কেডা—স্বয়ং গোপীনাথ নাথ।

যতক্ষণ নয়ন না ফেরে ততক্ষণ গরুর ল্যাজের বাড়িটা গোপনই থাকে মামীর কাছে।

তুপুর বেলা নয়ন ও তার মামীর একটা হাসাহাসি শোনা যায় রান্না ঘরে।

গোপী তাঁতের উপর থেকে বলে, হইছে, হইছে, আর ঢলাঢলিতে কম্ম নাই, বেলা যায়। কাম আছে। খাইয়া ওঠ্ শীগ্‌গির।

[বার]

নিত্য নিয়মিত—

সূর্য ওঠে পদ্মদীঘির পূব পাড়ের গাছ পালার ফাঁক দিয়ে—সারা দুপুর আলো ছড়ায় ঘাস দল ও কলমীলতা ভরা টলমলে জলে। আবার সন্ধ্যা বেলা অস্ত যায় পশ্চিম দিগন্তে বড় বড় তাল তেঁতুল গাছের আবডালে। মাছ-রাঙা আসে, ডাহুক ডাকে, বক ওৎ পেতে থাকে জলের কিনারে। সাপলা ফোটে, বকুল ঝরে, কেয়া ঝোপ বাড়ে অবাধ বিক্রমে।

সময় মতো মেয়েরা দল বেঁধে শ্বেত পাথরের ঘাটলায় এসে বসে। ভাঙা ঘাটলা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামে—যে যার স্নান করে জল নিয়ে চলে যায়। হয়তো জমিদার বাড়িটার দিকে কেউ ফিরে তাকায়, আবার কেউ হয়তো ওদিকে চোখই ফেরায় না। ধ্বংসস্তূপ যেন ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। দোয়েল শ্যামা বুলবুলির শিস ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় চারদিকে।

চার প্রহরেই শিয়াল ডাকে…

সজারু বুনো ভাম অষ্টপ্রহরই নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদিক ওদিকে আহার সংগ্রহ করে…শিকারের ওপর যখন তখন লাফিয়ে পড়ে। কত সাপ যে খোলস বদলায়, কত হিংস্র সরীসৃপ যে চলা ফেরা করে! গ্রামের মানুষ দীঘির ঘাটলা পর্যন্তই আসে। তারপর আর কেউ ভিতরের দিকে এগোয় না। ভয় বিস্ময় ও নানা অপদেবতার কাহিনী জড়িয়ে বাড়ির ভিতরটা একটা স্বপ্নরাজ্য হয়ে রয়েছে যেন।

বুড়োরা তো জানেই—তমালতলার কোলের ছেলে-মেয়েরাও জানে যে, কোন্ কোন্ বৌরা ওখানে পেত্নী হয়ে রয়েছে, কার কার গরু মোষের দিন-দুপুরে ঘাড় মটকে কবন্ধরা রক্ত খেয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই সন্ধ্যা বেলা এসব

আলোচনা হয়, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে শোনে, তারপর ভয়ে ও শংকায় চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু এসব আলোচনা ময়নার ওখানে কোন দিনই হয় না। বুনো বেদেনী ওসব প্রসংগে রস পায় না, বরঞ্চ সাপের শিকারের, জংলা মোষের গল্প হলে তার খুব ভাল লাগে। যে এসে গল্প ফাঁদে তাকে উঠতে দিতে চায় না ময়না।

কিন্তু সব জংলা প্রসংগই চাপা পড়ে গেছে এখন।

ভৈরব একতারায় সুর করে। আবার একতারাটা বেসুরা ক'রে ময়নার হাতে দেয়।

এবার সুর বাঁধ ময়না—দেখিয়ে দিলাম তো।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ময়না বলে, হামি তো পারি না গোঁসাই।

পারবে, পারতে হবে—এই তো প্রথম সোপান!

ময়না ছোট্ট একটি মেয়ের মত হেসে কুটি-কুটি হয়। সাবান, সাবান দিয়ে হামি করবেক কি?

সাবান নয়, সোপান—সিঁড়ি, ঘাটলা।

নির্বোধ বুনোকে নিয়ে ভৈরব বিষম বিপদে পড়ে।

থাক সুর বাঁধা। তুমি একটা গান গাও—আমার সংগে সংগে গেয়ে যাও।

একটা ভজন গান ধরে ভৈরব, কিন্তু ময়না তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গায় না! সে অবোধের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন একটা জংলা পাখি—পোষ মেনেছে, কিন্তু ভাষা শেখেনি।

ও কি?

হামি তো ভাসান গান জানি—ভাবের গান বুঝিক নি।

কিন্তু বুঝতে যে হবে, শিখতে হবে, ময়না, নইলে লাভ হলো কি?

কেন? আমি গান শিখবেক না, শুধু তাকিয়ে থাকবেক তোর মুখের দিকটিতে। দিলে যখন ধরবেক, তখন পারবেক গাইতে। গুরুরে, দিলে মিল চাই, বুঝলি?

দিনের পর সন্ধ্যা আসে—সন্ধ্যার পর রাত্রি। এমনি ক'রে গ্রীষ্মের পূর্ণিমা কাটে পদ্মদীঘির পাড়ে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বকুলের গন্ধ ভাসিয়ে নিয়ে আসে। চাঁদের আলো ক্রমে পাণ্ডুর হয়ে যায়।

আসে কৃষ্ণা তিথি। এক অব্যক্ত রূপ ঝিকমিক করে নক্ষত্রের আলোকে। প্রকৃতি এখন অস্পষ্ট—কিন্তু মুগ্ধ। ঠিক ময়নার মতো যেন কান পেতে গান শুনছে—যে গান উথলে উঠছে পদ্মদীঘির বুক থেকে।

ময়না!

কি?

এখনও কি ধরতে পারলে না সুর? একখানা গান গাও শুনি।

ময়না যা-ও শিখেছে তা-ও লজ্জায় গাইতে পারে না।

দুপুরবেলা যখন কেউ থাকে না তখন ময়না একা একা বসে গুনগুন করে। তারপর একটু জোরে—তারপর আরও জোরে। নিজের কণ্ঠ শুনে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। তার ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে ভৈরবকে শোনায়।

নিজের মনে গৌরব অনুভব করে ময়না।

সে গানও শিখেছে—গেরুয়া বসনও পরেছে। এখন মন তার বাসনা মুক্ত। তাই কেউ মাছ ধ'রে নিলে সে সেদিকে ফিরেও তাকায় না। সযত্নে পাহারা দিয়ে রাখে না বাগানের আম কাঁঠাল। যে যার খুশি মতো পেড়ে নিয়ে যায়—বাঁশ কেটে নিয়ে যায় চোখের ওপর দিয়ে।

রোজই আসে ভৈরব—কখন সকালে, কখন সন্ধ্যায়। ময়না যা শিখছে তা গোপন করে, শুধু গোপন করে না তার গেরুয়া বাস্—চটুল চাহনি!

কিন্তু সে দিকে সন্ন্যাসী ফিরেও তাকায় না।

একটু দুঃখ হয়। একটু যেন অভিমানও হয়। ময়নার অজ্ঞাতে কি যেন তার মনে অংকুর মেলে। সোহাগিনী কিশলয় এর পর হয়তো পাতা মেলবে, তারপর হয়তো ছেয়ে ফেলবে চারদিক।

যতদিন যায় ততই তার আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হয়। ভৈরব না আসা পর্যন্ত সময়

তার কাটতে চায় না। সাধু এলে আবার সময় তার দুরন্ত গতিতে কেটে যায়।

এমনি সময় একদিন সংবাদ আসে তাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে তার বাবার বন্ধু—রাজা সাহেব। তার মেয়ের বিয়ের উৎসব। লোক এসেছে নৌকা নিয়ে—হুকুম, বেটি না এলেও ধরে নিয়ে যেতে হবে। কারণ অনেকদিন দেখেনি ময়নাকে। উৎসব, এক চাঁদ বাদে—মধু-জোনাকে—কিন্তু যেতে হবে এখনি। চাচি নেই, ওকেই করতে হবে সব।

মেহেরবান চাচা! কত কথা মনে পড়ে ময়নার। শৈশব, বাল্যের ও কৈশোরের। কত ভালবাসে তাকে চাচাজী। সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না এ জমায়েৎ।

কিন্তু দু'দিন বাদে গেলে হয় না? ভৈরব কি ভাববে?

সন্ধ্যা বেলা সকলই শোনে সাধু। সে বলে, বেশ তো। যদি দু'দিন বাদেই যেতে চাও, তাই যেও।

তুই যাবি গোঁসাই হামার সাথে?

একটি প্রাঞ্জল ক্ষুদ্র উত্তর। না।

ওঃ!

নয়নকে সংগে নিয়ে যেও, তোমার চিন্তা কি ময়না? বাসাটা খালি থাকবে, বরঞ্চ আমি এসে এখানেই রাত কাটাব।

সাধুর এ সরল সাহায্য কেমন যেন ব্যংগের মতো ঠেকে ময়নার কানে।

লাগবেকনি—হামি কত লোক পাবেক।

ভালই তো। আমি না হয় এ ক'টা দিন বংশীতলায় কাটিয়ে আসব। এবার পূর্ণিমার উৎসবটা ওখানে হবে কিনা!

যা না, এখনই যা—হামি চাহিক না তোকে। বুনো বাঘিনীর মত ক্ষেপে ওঠে ময়না, চোখে মুখে তার রক্ত ঝলকায়।

ভৈরব ধীরে ধীরে উঠে আঁধারে মিলিয়ে যায়।

অনেক দূরে গিয়ে সে মৃদু স্বরে একখানা দেহতত্ত্বের গান ধরে—

কাণ্ডারী হে কাণ্ডারী

আমি কেমন করে দেব পাড়ি…

দুরন্ত এই ভোগের নদী……ইত্যাদি

ময়নার আজ আবার মনে পড়ে বংশীতলার মেয়ে দু'টির কথা—বিশেষ ক'রে রূপবতী চন্দ্রার। কথায় কি হল—বোধ হয় সাধুকে সাপের খেলা দেখাবে!

কিন্তু ময়না তো কোনো খেলাই দেখাতে পারেনি ভৈরবকে। সেকথা তার স্বপ্নেও মনে আসেনি। নিশ্চয় ঐ রূপসী সাধুকে দেখাচ্ছে খেলা। নইলে সাধুর এত টান কেন বংশীতলার জন্য? ভৈরব চলে গেলেও বেদেনী জ্বলতে থাকে।

উচিত ছিল এতদিনে সাধুকে এ সব জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু বেদেনী তা পারেনি। ভৈরব সব ভুলিয়ে দিয়েছে। তার উপস্থিতি যেন মন্ত্রৌষধি। সাধু তার ভাল নয়। দু' নৌকায় পা দিয়ে চলছে।

এবার দেখা হ'লে সে নিশ্চয় সাধুকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। খুলে ফেলে দেবে তার মুখোস। গেরুয়া পরিয়ে ময়নাকে বৈরাগিণী করে আর একজনের সঙ্গে সম্ভোগ! উঃ, কি সাংঘাতিক মানুষ! সাধু তো নয়, শয়তান।

এখন তাকে পেলে ময়না হয়তো আঁচড়ে কামড়ে নখরে দংশনে জর্জরিত করে ছাড়ত। ময়না ভাবে, কত দূর গেছে ভৈরব? সে ছুটে পদ্মদিঘীর পাড় পর্যন্ত যায়।

কিন্তু সাধু অনেক দূরে চলে গেছে। বেদেনী কান পেতেও তার গান শুনতে পায় না।

সে পাগলের মত অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়।

তপ্ত কড়াইয়ে তাকে যেন কে ভাজ্‌ছে।

সে ঘুরতে ঘুরতে শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফেরে।

ক'দিন যেতে না যেতেই ময়না নয়নকে নিয়ে রওনা হয়ে যায়।

বাসা রক্ষার ভার নেয় গোপী।

কতদিন বাদে আবার ময়না নৌকায় চড়বে। আনন্দ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় না। মনটা তার বিক্ষিপ্ত।

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে গিয়ে নৌকা কেরায়া করতে হবে—তারপর জোয়ার এলে পাড়ি জমাতে হবে উত্তরমুখে। যেতে হবে জামবেঁকির চৌমোহনা দিয়ে। সেখানে গিয়ে একটা বড় পাড়ি। তারপর ধুলোট রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে ক' কোশ যেন গিয়ে রাজা সাহেবের বহর (অনেকগুলো নৌকা)। তাড়াতাড়ি হেঁটে না গেলে জলপথে ঘুরতে হয় একটা প্রকাণ্ড চর—তাতে মিছামিছি দিনচারেক থাকতে হয় নৌকায়। এটা নাকি দামোদরের চর। ক্রমে ক্রমে চর পড়েছে আর নদী সরে গেছে ক্রোশ পাঁচেক।…

এখনও ময়না এবং নয়ন কেরায়াঘাটে পৌছাতে পারেনি—সবে আধাআধি পথ এসেছে। না-না, অর্ধেকের কিছু বেশীই তারা ছাড়িয়েছে—ঐ তো শ্যাওলার বারুই বাড়ি। কত সারে সারে পানের বরজ। তার চারপাশে গড়খাই—পরিখার মতো বেড়। চোর ছ্যাঁচড় জীবজন্তুর ভয়েই ওসব বেড় কাটে পানের বরজের চারদিক ঘুরিয়ে। আলের ওপর এমন সব কাঁটাগাছ রুয়ে রাখে যার একটা কাঁটার ঘা খেলে জন্মের মত কর্ম সারা। তবু কি বারুইরা চোরের হাত এড়াতে পারে!

ময়না গেরুয়া শাড়ি পরে আসেনি। পরে এসেছে একখানা জংলি শাড়ি। পুরান হলেও বেশ দামী। মাথায় তার সাপের ঝাঁপি। বাসার ভার নয়েছে গোপী, কিন্তু সাপের ভার নেবে কে?

বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ময়নাকে। নয়নের বেদেদিদি—এবার ঠিক বেদেনীর

রূপই ধরেছে। নয়ন কেবলই ফিরে ফিরে পিছনের দিকে তাকায়। ঠমকে ঠমকে গমকে গমকে এগিয়ে আসছে ময়না ধানী জমির আলের পথ ধ'রে। কখনও উৎরাই কখনও চড়াই ভেঙে।

আর বেশী দূর না—ওই তো দেখায়।

হামার কাঁধের বোঁচ্‌কাটা একটু লিবি লয়ন ?

এ আর কওয়া লাগে! তয় সংগে আইছি ক্যান্? আমি তো আগেই নিতাম। ভাবলাম টাকা-পয়সা আছে নাকি ?

এত ডর! বেকুপ্‌ কাঁহাকা। ডর করলেক কি তোকে লিয়ে পথ চলি ?

বোঁচকাটায় কি বুইনদিদি ? এত যে ভার!

ওটায় নানান চিজ আছে। মেয়েকে হামি সাজানি দিবেক।

কি কি আছে ময়নাদিদি ?

তাগা, মল, রূপার হাঁসুলি। আর ডেক্‌চি আছেক একটা। দিয়ে দেবেক সব, হামি করবেক কি!

তাই বুঝি দুইদিন ছুটাছুটি করছ মহিম স্যাকরার বাড়ি ?

ময়না বলে যে তার কাছে অনেক পুরানো রূপা ছিল, তাই ভেঙে এসব গড়িয়ে দিল তার বহিনকে। এমনি একদিন নয়নের বিয়ে হ'লেও সে অনেক কিছু গড়িয়ে দেবে ভাউজকে।

নয়ন বলে, ধেৎ।

লাজ করিস মরদ, একদিন তো সাদি হবেক।

কথায় কথায় ওরা কেরায়াঘাটে এসে পড়ে।

কত চাও জামবৈকি যাইতে ?

দেড় টাকা।

এত! বার আনা পাইবা। নয়ন বলে।

ঘাটে সারি সারি এক বৈঠার ডিঙি। কোনো মাঝি বার আনায় যেতে রাজী হয় না। ময়না দেরী না করে পাঁচ সিকা বলে। নয়ন একটু অসন্তুষ্ট হয়।

বুইনদিদি তোমার দেখি বড় গরজ ?

আচ্ছা ঘাট হয়েছেক—মাপ কর।

নয়ন নদীর চরে নেমে ঘুরে ঘুরে দর-কষাকষি করে। কোন মাঝিই রাজী হয় না।

ময়না কূলে ব'সে নদীর দিকে চেয়ে থাকে। বিরক্ত বোধ হয় নয়নের এ কৃপণতায়। কিন্তু কিছু বলতেও সাহস হয় না তাকে। আচ্ছা চলনদারের পাল্লায় পড়েছে সে !

মাঝিরা ময়নার দিকে চেয়ে একটু চোখ ঠাওরা-ঠাউরি করে।

অত সস্তায় পাবা না বাইস্থা বুইন।

এয়া সাপের খেলা না—পরাণ হাতে লইয়া পাড়ি দেওয়া। নদী তো না, সমুদ্দুর। জামবেঁকির চৌমোহানার নাম শোন্‌ছ ?

ওরে নাইয়া, মায়ের কাছে কহিস মামাবাড়ির কেচ্ছা। হামি নাইয়া বাইস্থার ঝি।

বেশ ! তয় আর কইলাম না।

অবশেষে একজন ছোকরা মাঝি রাজী হয়। সে দেশে যাবে—বাড়ি তার ঐদিকে।

ঘাটমাঝি টাকা-প্রতি দু'আনা খাজনা দাবী করে।

কেরায়া কত ?

নয়ন ও মাঝির মধ্যে চকিতে একটা চাহনির আদান-প্রদান হয়।

আষ্ট আনা।

অতদূর যাবে আট আনায় ?

হয় কর্তা, ত্যাশে যামু কিনা, এখন যা পাই।

দাও আমার পয়সা চারটা। কিন্তু যেমন কেরায়া ধর্‌ছ তাতে ঐ আট আনাই পাও কিনা দেখ না। কই গেছে তোমার চলনদার—নামধাম বললে না ?

ক্যান্, বোঝলেন কিসে যে কেরায়া দিমু না? নয়ন সুমুখে এগিয়ে আসে। আমার নাম নয়নচন্দ্র নাথ। বাড়ি তমালতলা। যামু—

আর যে মুখে রা নেই? যাও, যাও, আর লাগবে না। ওরকম রোজ রোজ কত ছোকরা আমার ঘাট থেকে যে পার হয়। ইংগিতটা ময়নার প্রতি।

নয়ন দাঁত কড়মড় ক'রে চ'লে আসে।

জোয়ার এসেছে।

মাঝি এক বৈঠার ডিঙিতেই পাল খাটায়—ছোট জামরঙি পাল।

ঘাটমাঝিকে ঠকিয়ে যে ক'টা পয়সা রেখেছিল নয়ন তাই দিয়ে বিড়ি কিনে এনেছে। তিনজনে তিনটা বিড়ি ধরায়। ময়না গোটা দুয়েক টান দিয়েই বিড়িটা জলে ফেলে দেয়। তার কাছে এ বিড়ি কড়া লাগছে না। সে বোঁচকা খুলে হাতে তৈরী বিড়ি বার করে।

মাঝি বলে, শালায় টের পাইছে।

নয়ন উত্তর দেয়, পাইছে পাউক। যে চামার, টাকায় দুইআনা মুনুফা!

ময়না হাসে।

কৃষ্ণাতিথির চাঁদ উঠেছে আকাশে। আধখানা পাণ্ডুর চাঁদ। কিন্তু তাতেই যা জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে, দেখে নয়নের মনে কেমন যেন ভাব জাগে। সে বিড়ি ফেলে দিয়ে গলুইতে গিয়ে বসে। অফুরন্ত জল—শুধু জল। কলকলিয়ে ছলবলিয়ে যেন উছ্‌লে উঠছে। দু'পাড়ের গাছগাছালি নীল তুলিলেপা। কোন গাছটায় ফুল ফুটেছে, কোন গাছটায় ফল ধরেছে—কোন্‌টা বন্ধ্যা তা এখন আর সঠিক চেনা যায় না—তবু সমগ্র নীল রেখা যেন একটা রহস্যের এবং মাধুর্যের আলেখ্য বলে মনে হয়। শুধু নয়নের কাছে নয়—জংলি ময়নার কাছেও।

ময়না এমনি জোনাকে কত পাড়ি জমিয়েছে। কত গালমন্দ খেয়েছে বাপের। তখন রাগ হয়েছে বাপের ওপর—আবার দুঃখ হয়েছে মার জন্য।

মার স্নেহ সে-কোন দিন পায়নি, কিন্তু সে-আস্বাদ পেয়েছিল চাচির স্নেহে ও

যত্নে। সেই চাচির মেয়ের বিয়ে, কিন্তু চাচি আজ কোথায়? কোথায়ই বা ময়নার বাপ?…আজ তার আদরের জন কেউই জীবিত নেই। যদি তার বুড়ো বাপটাও থাকত! হয়ত দু'চারটা গালমন্দ করত—কিন্তু তাকে দেখে মনে মনে খুশী না হয়েও পারত না। হাজার হ'লেও হাতে ছেনে মানুষ করেছে তো! ছোট কালে সে বড় ঝাঁপি নিয়ে চলতে পারত না, বড় ঝুলিটা ঝুলে পড়ত হাঁটু পর্যন্ত। তার জন্য ছোট ঝাঁপি বুনে দিয়েছিল তার বাবা, ছোট থলে সেলাই করিয়ে এনেছিল চাচির কাছ থেকে। চাচি ঠাট্টা করত—এত দরদ সাত-ভাতারীর ঝির লাইগা? নাইয়ার পো, বোঝলাম না অথটা।

বোঝবা কি! মাইয়া হামার খান্‌কি না—খান্‌কি ছিলেক ওর মা।

সবাই গেছে। কোনও সম্বন্ধ নেই এখন আর রাজা সাহেবের বহরের সঙ্গে। শুধু মাত্র বেঁচে আছে একা ঐ বুড়ো রাজা সাহেব! তার ভরসাই বা আর ক'দিন! বুড়ো মানুষ—এই আছে, এই নেই।

তার বাপের মরার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানাও যেন দুঃখের ঘায়ে জীর্ণ হয়েছে। কোন যুগের নাও! চলত শুধু জোড়াতালি মেরামতে।…প্রথম ভাঙল গলুই তার পর হালের মাচা। ক্ষয়ে ঝরে গেল ছই, চালি, পাটাতন। তারপর নোনায় খেয়ে ঝাঁঝর করল পাঁজরের হাড়—তলির তক্তা। অনেকে বেচে টাকা নিতে বলল ময়নাকে। ময়না সংবাদ পেয়ে পদ্মদীঘি ছেড়ে দেখতে এলো কিন্তু বেচতে পারল না। ওই নৌকায় বসে ওর মায়ের সাদি হয়েছে, ওর জন্ম হয়েছে। বুড়ো বাপ মরেছে ওই নায়ের পাটাতনে শুয়ে। ও তো নাও না, ওদের পরিবারের মা ছিল—বুঢ়া আম্মা!

ময়না চলে আসার পর একদিন বন্যায় নাকি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যাক, হাড় জুড়িয়েছে বুড়ির।

তারপর থেকে ময়না আর এদিকে আসেনি।…

কিছুই তো নেই, কিছুই তো চিরদিন থাকে না। সাধু যা বলেছে তাই তো ঠিক! তবে কেন সাধুর ওপর গোখ্‌রো সাপের মত ফণা ধ'রে উঠল ময়না?

কেন ছোবল তুলল? ও অজ্ঞানী। সাধু কি মাপ করবে না ওকে? অমন সুন্দর গম্ভীর মানুষ কি গোসা করে থাকতে পারে কখনও?

ও অবুঝ—ও জংলি।

এখন একটা উল্টা ছোবল মারতে ইচ্ছা করে নিজের বুকে ময়নার।

নয়ন একটা বাঁশী এনেছিল সংগে। বাঁশীর বুক ভ'রে একটা পদাবলীর মধুর মূর্ছনা ছড়িয়ে দিতে থাকে নদীর বুকে। সুরে মধু, অর্থে মধু—মধুময় হয়ে ওঠে ময়নার প্রাণ।

ডিঙি চলেছে, কখন একটু দুলে, কখনও ধীর স্থির হয়ে সোজা উত্তরে। ছোট ছোট ঢেউ চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে মিষ্টি জ্যোৎস্নায়। মাঝে মাঝে চর দেখা যায়। যেন শান্ত এক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ঘুমিয়ে আছে পাণ্ডুর ভাঙা চাঁদের আলোতে। মাখনের মত মোলায়েম তার দেহ। কিন্তু এ চর, চর না—পাগলা গাঙের লীলাখেলা। এক শীতে জাগল, হয়ত ফিরে শাওনে ভাঙল—এমনি একটা ধারণা আছে এ-দেশী লোকের মধ্যে। তবু চর দেখলে ক্রমবর্ধমান দু'পাড়ের জনতার মনে আশার সঞ্চার হয়। ভাবে—হয়ত টিকলেও টিকতে পারে। এমন তো কত চর টিকে গেছে, কত গাছপালা মানুষজনে ছেয়ে গেছে। সে-সব চরের বুকে এখন জন্মাচ্ছে নানাবিধ ধুলোট কৃষি—মুগ, মুসুরী. আখ, আলু।

নয়ন বাঁশী বাজাচ্ছে, ম্লান চাঁদ অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে।

জামবেঁকির এত বড় চৌমোহনা পাড়ি দিয়ে এপাড় ঘেঁষে চলেছে নাও—তবু খেয়াল নেই কারুর।

এক সময় বাঁশী থামে। অমনি ময়না জিজ্ঞাসা করে—লয়ন?

কি বুইনদিদি?

তুই এমন বাঁশীটি বাজাতে শিখলি কার ঠাঁই?

তোমার গোঁসাইর ঠাঁই।

হামার একার গোঁসাই লয়রে—সবাইর গোঁসাই, সবাইর গুরু।

তাইতো সকলকে ছেড়ে একা ময়নার সঙ্গে আসতে পারেনি। এবার

পূর্ণিমার মেলানী হবে বংশীতলা—গুরু না থাকলে চলবে কি ক'রে? তখন ময়না তলিয়ে বোঝেনি!

কিন্তু, কিন্তু…

শ্যামলী গুরুকে পাবে…আর একটির নাম সে তো জানে না! সে ও পাবে—শুধু পাবে না ময়না।

সে এখনি ফিরবে—যাবে না, যাবে না সাদির উৎসবে। নয়ন!…

কি কও বুইনদিদি?

মেহেরবান চাচার বুড়ো মুখখানা তখনি ফুটে ওঠে ময়নার সুমুখে—বেটি!…

কিছুই তো কইলা না বুইনদিদি—ডাক্‌লা যে? ঘুমাইছ?

না—মাঝিরে একটু বাইতে ক' জোর্‌ছে।

[চৌদ্দ]

চাঁদ অস্ত গেছে চর-গোখুরীর বনজাংগালের অন্তরালে। ঠিক অস্ত যায়নি—এখনও সামান্য জ্যোৎস্নার আভাস আছে নদীর জলে। নদীটা এখানে এসে বেঁকে গেছে গোখুরের মত। তাই নামটা হয়েছে চর-গোখুরী। প্রকাণ্ড চর—অনেক লোকের বসতি। ফসলের জমিও বিস্তর, ফলনও প্রচুর।

নয়ন নামে বোঁচ্‌কা নিয়ে—ময়না নেমেছে ঝাঁপি কাঁথালে।

ভাড়া?

দিলাম যে।

খোরাকী?

কথা আছে তোমার সাথে?

কও দেখি বাইন্তাদিদি— ভদ্দরনোকের সাথে এর আবার কথা থাকে নাকি?

গোলমাল না ক'রে নয়নকে চার আনা পয়সা দিয়ে দিতে বলে ময়না।

এই চাইর আনায় ক'জন খাইতে পারে? বাড়িতে কি-ওক্তো চাউলই তো লাগে তিন স্যার।

আমরা কি ম্যাজবান (নিমন্ত্রণ) খাওয়ামু নাকি বাড়ি সমেত—পাইছ কি?

পাইছি তো বিয়ার কেরায়া। আমি তো যামু না, তার লাইগা কি খামু না?

দিলাম তো তোমার খোরাকির পয়সা।

সকলডির কি এতে হয় বাইত্যাদিদি—যাও একটা শুভ কাজে, অত হিসাব করলে চলে? উনি বড় শক্ত মানুষ। তুমি এট্টু কইয়া দাও। একলা কেও খাইতে পারে ভাই-বুইন ফেইলা? উনি কেমন বুঝমান.?

কল-কৌশল করে মাঝি সেই পাঁচ সিকাই আদায় করে।

ময়না বলে, কিরে লয়ন?

নয়ন কোনও জবাব দেয় না।

চর-গোখুরীর ভিজা চরে পা দিয়ে ময়নার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ছোটকালের সহস্র স্মৃতি এই নদীর চরে জড়িয়ে রয়েছে। কোথায় বসে ও গামছা পরে খেলেছে—কতটুকু জলে নেমে গামছা খুলে সঙ্গিনীদের সঙ্গে মাছ ধরেছে, এখনও তা স্পষ্ট মনে আছে ময়নার। এমন দিন গেছে যেদিন ওর বাপ কিছুই রোজগার ক'রে আনতে পারেনি গ্রাম থেকে—কেউ দাওয়াই নেয়নি, কেউ সাপের খেলা দেখেনি—সেদিন ওর ধরা চুনোপুঁটির পাত্‌রা দিয়ে চালিয়ে দিতে হয়েছে চারটি চাল চেয়ে এনে। রাজা সাহেবের তখন অবস্থা ভাল ছিল না। সে-ই ধার দিয়েছে বটে—কিন্তু সামান্যই দিতে পেরেছে। আর যাদের ধার-কর্জ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তারা মুখ ফিরিয়ে তাকায়নি। কারণ তার বাবার অনেক দোষের মধ্যে একটা দোষ ছিল—স্পষ্ট কথা, যখন-তখন যার-তার মুখের ওপর বলা।...রাত হলে কে কার সাংগাত (সঙ্গিনী) ফেলে কার নৌকায় হানা দিত—ভোরবেলা তার বাপ তা বলে দিত। তখন ভাল ক'রে এসব কথা বুঝত না ময়না—এখন ভাবতেও লজ্জা হয়।

তমালতলার গ্রামভরা গরিব গৃহস্থ। কতলোক সাদির উমর পেরিয়ে গেছে, কতছেলে জোয়ান-মরদ হয়েছে—কৈ তারা তো হানাহানি টানাটানি করে না কারুকে। হয়ত কেউ কিছু করে—পুরুষ ছেলে ষাঁড়ের মত তেজি, ছুটবেই তো এদিক-ওদিক—কিন্তু তা আপোষে। চেঁচামেচি হয় না বেদে-মাঝির নায়ের মত।

ওর বাবাই ছিল ঢাকের বাঁয়া—শুধু শুধু থন থন করে বাজত।

ওর সঙ্গেও তো একটা পুরুষ আছে—নয়ন। ষাঁড়ের মত নয়া তাগড়া। তাগড়া না হাতী! ময়নার কাছে একটা বাছুরের সামিল—দুধে, দু-দাঁতের বাছুর। দেখবে নাকি পরখ করে!—হ্যাঁরে মরদা।

কি কও বুইনদিদি? বড় ঘুম পাইছে। এখানে কোন বাড়ি চেনা নাই? লও একটু ঘুমাই—বিহানে যামু।

তখনই ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ে—উষার রাঙা আলো, চর-গোখুরীর আকাশে।

কি নরম গলা, কি নিষ্পাপ ডাক! ময়নার মন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। ক্রমে শুভ্র শুচি হয়ে যায় ভোরের আলোর মতো।

ময়না ওর বহিন।

দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে চলতে থাকে।

ভোরের বাতাসে যেন নেশা ভাঙে নয়নের।

সে চোখমুখ রগ্‌ড়ে পথ চলতে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে শিশিরে ভিজা দোয়াঁশ মাটি বেশ নরম লাগছে পায়। এত সময় নৌকায় বসে যে জড়তা এসেছিল তা যেন হঠাৎ দূর হয়ে যায়। মাটির স্পর্শে আর ভোরের বাতাসে কি যেন আছে!

ময়নারও জ্বালা নিবেছে।

এর মধ্যে একটা ঘটনা হইছে, তা তো তোমার কাছে কই নাই!

কি ঘটনা? ময়না উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

নয়ন সেদিনের ব্যাপারটা খুলে বলে—যেদিন গোপী প্রভৃতি সবাই ভেবেছিল যে তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে পুলিশ সাহেব নায়ে।

জমিদারিটা নাকি তাঁরই, সেই ফর্সাপানা সুন্দর বাবুরই—যিনি ওকে ডেকে নিয়েছিলেন গ্রীণ বোটে। তিনি শীগ্‌গিরই আসবেন—নৌকায় বসে তিনি এসব কথাই বলেছিলেন। আর নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ময়নার কথা। কেমন দেখতে, কত বয়স, স্বভাব-চরিত্র কেমন? যেন সম্বন্ধের কথা! তিনি পুলিশ সাহেব নন।

তুমি বিয়া বস্‌বা নাকি বুইনদিদি? বাবু দেখতে রাজার মতই।

লয়ন, মুখটি তোর শিলিয়ে দেব—চুপ কর গাধা।

তোমার সাধুর থিকা ঢের ভাল—সাধুর আছে কি? একটা একতারা আর একটা ঝুলি!

এই সকালবেলা চুপ করবিক নি লয়ন—ঝগড়া করবিক! কাজের কথা ক'!

আচ্ছা, কি কবা কও!

বললেক কি?

জমিদার বাড়িটা আর দীঘিটা নাকি তাঁর। এবার আইসা নাকি দখল করবে।

পদ্মদীঘি? টাংগি দেখে নি তোর বাবু।

আমি আনলাম সম্বন্ধ—কন্যায় দেখায় কুড়াল। এ তো বাহারিয়া বিয়া!

তামাসা লয়—ওরে গহিন কথা। এতদিন হামাকে বলিসনি ক্যান্?

নয়ন একটু ফাঁপরে পড়ে। তাই তো, বুঝি নাই আমি।...

চ্যাংরামি তো বুঝিস খুব।

তারপর গম্ভীর হয়ে ময়না হাঁটতে থাকে। নয়ন আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। সে বুঝতেই পারে না এমন একটা কি অন্যায় কথা সে বলেছে যার জন্য চিররহস্যময়ী ময়নার হঠাৎ ঘটেছে এমন পরিবর্তন।

দোষ করলে মাপ করো বুইনদিদি—মুখ ভার কইরা থাইক না।

ময়না জবাব দেয়, পাগলা! হামি কি ভাবছেক, তুই কি বুঝলিক!

আমি অত ভাবের কথা বুঝি না, তা বোঝে তোমার সাধু—সোজা-সুজি কও, রাগ হইছ নাকি ?

নারে বেকুপ্‌ না। ব'লে সে পূর্বের মত খিলখিল করে হেসে নয়নকে চম্‌কে দেয়।

তোর দিল্‌টে ভরা বিলকুল মরদানী আর রিষ (হিংসা)! সাধুকে তুই দেখতে পারিস না। না রে নয়ন ?

হুঁ, তাই বুঝি ?

আবার লাজও আছেক!

একটু পরে ময়না আবার বলে, তোর বাবু পদ্মদীঘির পাড়ে পা বাড়ালে হামি টাংগি দিয়ে সমঝে দেবেক। ময়নার চোখে আগুন জ্বলে।

নয়ন ভয় পায়।

তোর ভয় কি ভাই—তুই তো হামার দোঁহার।

ময়নার চোখে আবার স্নেহের বন্যা নেমে আসে।

[পনর]

নদী থেকে একটা চওড়া জলরেখা চরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। একদিকে গাঙ আর তিন দিকে উঁচু চর—ঠিক পুকুরের পাড়ের মত ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চরের বুকে বড় বড় পাকুড় গাছ। এপার থেকে ওপার পর্যন্ত শাখা বিস্তৃত। গাছের নিচে প্রায় পঞ্চাশখানা বড় বড় নৌকা লগি পোঁতা। এই চচ্ছে রাজা সাহেবের বহর। বড় স্নিগ্ধ ছায়া শীতল স্থানটি। খুবই ভাল লাগে নয়নের কাছে।

ময়নাকে দেখেই রাজা সাহেব এগিয়ে আসে। হ্যাঁ, আরব-বেদুইনের বংশধর বটে। যেমন বুক, তেমনি পিঠ, তেমনি হাতের গড়ন। মাথার চুলগুলো ধবধবে শাদা—দাড়ি গোঁফও তেমনি।

আনন্দে ময়না তাকে একপ্রকার জড়িয়ে ধরে ডাকে, চাচাজী!

বেদুইন-সর্দারের তখন যে কি মনের অবস্থা তা আর বলা নিষ্প্রয়োজন।

নয়ন ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে।

প্রত্যেক নৌকা থেকে ডাক পড়ে তার। এসেছে একজনের সঙ্গে কিন্তু সমাদর করছে দশজনে। জীবনে এমন আদর সে কখনও পায়নি। বেদে বৌ-ঝিরাও তাকে দেখে লজ্জা করছে না। ডেকে ডেকে বিড়ি-তামাক খাওয়াচ্ছে।

সবগুলা নৌকাই ঘর-বাড়ির মত। তাতে না আছে এমন কোনও জিনিস নেই। বরঞ্চ ঘর-সংসার করতে যা যা দরকার তার চেয়েও অনেক বেশি জিনিস আছে। দড়ি-বৈঠা-নোঙর তো আছেই—আরও আছে নানা রকম অস্ত্র—ঢাল সড়কি ল্যাজা। ছোট বড় জাল। বাদুরমারা একনালা। বিষমাখানো তীর, পাকা বাঁশের ধনুক। শিকার করা এদের একটা পেশা—নেশাও বটে। দরকার হ'লে মেয়েলোকরাও সজারু কোপাতে পারে

—মাংসালো পাখিধরা ফাঁদ পাততে পারে বনে-জংগলে ঢুকে। এদের সকলের কথায়ই একটা মনমাতান ঢং আছে, চলনে গমক আছে, রঙ আছে চটুল চোখে।

একটা দিন যেতে না যেতেই নয়নের বেদেদিদি জুটে যায় অনেকগুলো। কিন্তু একটি মেয়ে তার সঙ্গে শুধু বেশি মেলামেশা করে না—তার নাম শুক বেগম। কিন্তু সবাই ডাকে শুখ বলে।

শুখ নাকি রাজা সাহেবের বাঁদীর মেয়ে। তাই তার প্রতিষ্ঠা নেই মোটে। শুখের চোখভরা কেমন একটা যেন দুঃখ। কাজকর্ম করে, হাসে খেলে, কিন্তু যখন সে স্থির হয়ে কারুর দিকে তাকায়, তখন তার চোখের বিষণ্ণ চাহনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নয়নের রান্নার যোগাড়-যন্ত্র করে দেয় শুখ। নদীর চরে উনান পেতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আলগোছে সরে যায়। নয়ন অনেক কাল হয় রাঁধছে, কিন্তু নুনপোড়া হয় সব তরিতরকারি।

বিশেষ কোনও জরুরী কাজ নেই, তবু মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের ফাঁক গলে একটু রোদ পড়লে তখনই চারখানা খুঁটি পুঁতে আচ্ছাদন টাঙিয়ে দেয়। আর যা কিছু তা প্রয়োজনের আগেই জোগায়। কে খায় এত সামগ্রী, তাও আবার যদি খেতে হয় নিজ হাতে রেঁধে? ঘি দুধ নয়ন নিতে ভুলে গেলে মেয়েটি দূর থেকে দেখিয়ে দেয়। বেশি কথা বলে না—শুধু আংরাখাটার ওপর হাত দু'খানা বিন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেমন ক'রে ভিন্ন জাতির অতিথিকে সেবা করতে হয় এরা তা ভাল করেই জানে।

নয়নের জন্য একটা তাঁবু টাঙান হয় নদীর চরে গাছের তলে। নইলে সে রাত্রিবাস করবে কোথায়?

রাত্রে সবাই মিলে নেশা করে। নয়ন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। একি সমাজ! মেয়েরাও কাছে এসে বসে। ঢকঢক্ করে গিলতে থাকে মদ।

খিলখিল করে হাসতে থাকে, যেন মুহুর্মুহু খসে পড়ছে বিজলী চমক। কয়েকটা চাটাই পাতা হয়েছে চরের ওপর জ্যোৎস্নালোকে। কয়েকটা মোড়াও। খানিক বাদে সে সব এলোমেলো হয়ে যায় চারদিকে। হাসির ঝলকে পলকে পলকে জ্যোৎস্নাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। মত্ত হয়ে ওঠে পুরুষগুলো। তাদেরই বা দোষ কি, পাগল করে মাতিয়েই তো দিচ্ছে মেয়েরা।

ময়নাকে এসে কয়েকজন জড়িয়ে ধরে। নয়ন শংকাকুল হয়ে সরে যাচ্ছিল, তাকে এসে গ্রেপ্তার করে তিনটি চটুলনয়না মেয়ে।

না, না, আমি খামু না, খাই না মদ।

চুপ, চুপ মরদ। তার গালে এসে ঘনঘন ঠোনা পড়ে চারদিক থেকে।

ছাড়, ছাড় আমাকে।

এবার পড়ে চুমো। বুইনদিদি! অসহায় নয়ন বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। রক্ষা করো আমারে।

কে জবাব দেবে? ততক্ষণে ময়নাও উন্মত্ত হয়ে যোগ দিয়েছে মৃত্যুতাণ্ডবে। সেও খিলখিল করে হাসছে নয়নের অবস্থা দেখে। তুই না খেলে ছাড়বেকনি, দামড়া বাছুর।

অগত্যা নয়নও খায়। সুকুমার দেহে টনক নড়ে ওঠে। মগজে চড়তে থাকে নেশা রি-রি করে। সে বকতে থাকে ইংলি-বিংলি, আরো দেও, আর একটু।

অবস্থা ভাল নয়, ক্রমেই নয়ন উন্মত্ত হয়ে পড়ছে। সে গড়াগড়ি দিচ্ছে মাটিতে, হাসছে-ক্ষ্যাপা হাসি। একটি নরম হাত বাড়িয়ে কে যেন তাকে টেনে তোলে। কে যেন তাকে জড়িয়ে ধ'রে তার তাঁবুতে নিয়ে চলে। পড়ে পড়ে যাচ্ছে নয়ন, তাকে ধরে রাখছে বিমর্ষ-দিঠি শুথ।

দুরু দুরু ক'রে হয়ত কাঁপছে তার বুকখানা।

কার জিনিস সে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে?

কে যেন চাকুর চকচকে ফলার মত দু'টো চোখ বিস্ফারিত ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে।

ও কে ?

ময়না।

শুথ আর সইতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি নয়নকে নিয়ে পালায়।

যে কোন ভাবে সট যখন ভেঙেছে ময়নার, তখন বর্বর আনন্দে সে একেবারে ডুবে যায়। সে বোতলের পর বোতল চালিয়ে যেতে থাকে। বড় খুশী হয় বৃদ্ধ চাচাজী। এখনো তার মেয়ে ঠিক আছে। হিম্মৎ আছে বিয়ে করবার, ঘর সংসার পাতবার।

রাজা সাহেব ময়নাকে ডাকে, বেটি।

ময়না কাছে আসে।

ওকে দলে ভিড়িয়ে লি—নয়নকে।

ময়না রাঙা চোখ জোড়া তুলে ধ'রে বলে, মন্দ কি !

তুই ঘর সোংসারি হ। একটি লাতীর মুখ দেখে যাই হামি।

সুকুমার উঠতি বয়সের মাংসাল মাংসপেশীগুলো ময়নাকে উত্তেজিত করে। সে হেসে যেন চোখের চাকুর ফালা জোড়ায় শান দেয়।

রাজা সাহেব ইংগিতে একজনকে ডাকে। লিয়ে আয় শুথকে এখানটিতে।

চুলের মুঠি ধরে শুথকে টেনে আনা হয়।

শুথের অশ্রু দেখে ময়না বর্বর উল্লাসে হাসে। মদ চলে গেলাসে গেলাসে। জ্যোৎস্না খানিকটা ঢুলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে। যে যার নায়ে ইচ্ছা মতো যাকে-তাকে ডেকে নিয়ে চলে যায়। কেউ গররাজী হ'লে মার-ধোর অশ্রাব্য অশ্লীল গাল-মন্দ চলে। আংরাখা, পরনের শাড়ি কোথায় কার যে পড়ে থাকে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

লাস্তেহাস্তে আনন্দে তমালতলার বেদেনী ডুবে যায় কামরসে। কামনা গলে গলে পড়ে যেন তার চোখের কোল বেয়ে।

রাজা সাহেব বলে, যা না বেটি, নয়তো মাটি হবেক রাতটি।

ময়না শুথের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে ! কে যেন এসে দাঁড়ায় তার

ভাবলোকে। স্নিগ্ধ শান্ত অনাহত প্রেমের দিব্যমূর্তি। সে নিমেষে মত বদলায়। সে তো কারুকে চায় না, শুধু তাকে চায়।

না গো না—হামি যাবেকনি।

তবে কে যাবেক বেটি? কে আছেক?

শুখ।

ঠিক বেটি, ঠিক।

ধুকপুক করে ওঠে শুখ।

গায়ের জামাটা তার খুলে যায়, গোছাতে পারে না লোল অঞ্চল। অর্ধেক আনন্দে, অর্ধেক বিস্ময়ে সে উঠে দাঁড়ায়। সে ধীরে ধীরে নয়নের তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে।

আজ তার চোখেও কম রঙ লাগেনি।

[ষোল]

সারারাত নয়ন কি মোহে যে সুখ সায়রে-ডুবে থাকে! ভোর বেলা তার আর কিছু মনে থাকে না। ঘুম ভাঙলে সে উঠে দেখে তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে শিথিলকবরী শিথিলবস্ত্রা শুখ। কি যেন একটা ঘোর অন্যায় করেছে! সে উঠে তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে পালাতে যায়, অমনি হাসির ছুরির নিক্কণ শোনা যায় বেদে বৌ-ঝিদের।

কি গো, লাজ হলেক এখন?

কাজ ফুরাইছেক বুঝি লাতি জামাইর?

এমন মরদের জাত মারলে ঐ বোবা মেয়ে শুখ!

তবে সকলেই জানে, জানে না শুধু নয়ন! সে অন্তর্নিহিত ঘটনা জানার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তেমনি বড় ভাল লাগে এদের রসান্বিত ব্যঞ্জনা।

শুখকে ঠেলে তোলে সবাই মিলে। ওঠ্ মাগী ওঠ্। চল্‌বি না গাঁয়ে?

চোখ রগড়ে শুখ উঠে বসে, ঢিলা জামাটা অাঁটোসাঁটো করে পরে, গুছিয়ে নেয় শাড়ি। বড় ভারি ঠেকে নিজের শরীরটা—গতরাত্রে তার ভিতরে যেন ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে এক নবযৌবনা দামাল নারী। আজকার শুখে আর তাতে যে কত পার্থক্য !

ঐ ভোর বেলাই বেদের দল গণ্ডায় গণ্ডায় ঝাঁপি বের করে—বৌ-ঝিরা কাঁধে তুলে নেয় ঝুলি। গতকাল তারা কেউ গাঁয়ে বার হয়নি ময়না ও নয়ন এসেছে ব'লে। আজ আবার নিত্য নিয়মিত শিকড়-বাকড়, বুনো জরি-বুটি এবং যে যা সুন্দর ডালা-কুলো বুনেছিল তাই নিয়ে গাঁয়ের দিকে চলে। চাচাজী, বহিন গো, ওলো ভাউজ—চোখে মিঠা মিঠা চাহনি। যেন মুখের মধু এবং চোখের ইসারা দিয়েই রোগ সারিয়ে দেবে। ওষুধ বিষুধ লাগবে না।

ময়না থাকে নায়ে, কিন্তু নয়নকে এরা ছাড়ে না—একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে যায়। হাসতে হাসতে শুখের একটা ঝুলি এক বেদেদিদি নয়নের কাঁধে দেয় ঝুলিয়ে।

মহা বিরক্ত হয় নয়ন। সে এসব ঠাট্টা পছন্দ করে না। বাড়ির দিকে ফিরবে কিন্তু যাদুকরীরা ওকে ছেয়ে ধরে। হাসি ঠাট্টা কোলাহলে ওকে কেমন যেন বিবশ করে ফেলে। নয়ন যেন একটা মধুর চাকা—ওকে ভাগ-যোগ করে খেয়ে ফেলবে সবাই।

ওদের এড়াতে পারে না গেঁয়ো তাঁতি।

সারাদিন ধরে ওরা না করে হেন কাজ নেই। সাপের খেলা, ওঝালি, বৈদ্যালি—যে যে-ফিকিরে পারে গৃহস্থ-বাড়ি থেকে ধান চাল নুন তেল বার করে আনে। কেউ বা সংগ্রহ করে দুধ, দধি। পাড়া গাঁয়ের মেয়েরা ওদের ধন্বন্তরী বলেই মনে করে—তাই যে বাড়িতে রোগ নেই সে বাড়ি থেকেও ওরা খালি হাতে ফেরে না।

যে বাড়ির মালিক একটু কড়া সে বাড়ির উঠানে সাপগুলো ছেড়ে

দিয়ে ডুবড়ি বাজায়। শেষ কালে মা-মনসার নামে কিছু খয়রাত চেয়ে নিয়ে উঠে পড়ে।

যদি এতেও কেউ শক্ত হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে রীতিমত বচসা করেও কিছু আদায় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মোট কথা কিছু না কিছু দিতেই হবে—নইলে এরা খাবে কি ?

শুথ অন্যান্যের তুলনায় নগণ্য। মুখে তো কথাটি নেই। তবু সে আজ একটু তৎপরতা দেখায়। জীবন ভ'রে এতদূর চাঞ্চল্য সে কোনও দিন প্রকাশ করেছে কিনা সন্দেহ।

ফেরার পথে তার বোঝাটাও মন্দ হয় না।

সঙ্গিনীদের মধ্যে কেউ কেউ দেখে হিংসা করে, কেউ কেউ ওদের বুনো ভাষায় এমন ঠাট্টা তামাসা করে যে ও ঘেমে ওঠে। শুথ কিছু মুখে বলে না, বুকটা ওর দুরু দুরু করে। একি হাল হলো ওর ? এমন কোনো কালে তো হয় না।

মাথায় বোঝা, বুকে বোঝা, বোঝা বলে ঠেকছে ঊরু জোড়া—তবু এগিয়ে চলছে শুথ। নয়নকে ছাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই যেন ওর সব হাল্কা হয়ে যাবে। বিষণ্ণ চাহনির ভিতর যেন একটি সব্রীড় কটাক্ষ ফুটে উঠেছে।

নয়ন ভাবে মন্দ কি এ জীবন! মন্দ কি ঐ শুথের সঙ্গ! ও তো শুথ নয়—সুখ•••স্বর্গের নটি !

বারবার চেষ্টা করেও শুথ নয়নকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না।

কে যেন বলে, একটু ওর বোঝাটিও নিতে পারিস না—দরদ নেই দিলে ?

নয়ন এগিয়ে যায়—

শুথ পিছিয়ে আসে—

ভারী মহব্বৎ তো—লতুন সাংগাত পেয়েছিস বুঝি মাগী ?

শুথ আবার ঘেমে ওঠে।

সারাদিন নয়ন খায়নি—তবু তার কষ্ট বোধ হয় না। কি যে আনন্দ, কি যে অনুভূতিতে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে !

সন্ধ্যা বেলায় নৌকায় ফিরে শুথ সব কাজ ফেলে নয়নের জন্ত রান্নার যোগাড় ক'রে দেয়। তাড়াতাড়িতে একটু ছোঁয়া পানি লাগে। সেদিকে লক্ষ্য করে না নয়ন। বারবার শুথকে বলে, তুমি যাও—খাও গিয়া—আমার আর লাগবে না কিছু।

শুথ যায় না।

ময়না এসে খোঁজ নেয় নয়নের। সে শুথকে চাচার তদ্বিরে যেতে বলে। কোথায় কি সে গুছিয়ে রেখেছে তা ব'লে দেয়। তারপর নয়নকে খেতে বসায়।

নয়নের মন যেন অন্তদিকে আকৃষ্ট—সে পেট ভ'রে খেতে পারে না। ময়নার দিকেও চাইতে পারে না। কেমন যেন লজ্জায় চোখের পাতা নেমে আসে।

ময়নার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বচ্ছ কাচের মতো সব ধরা পড়ে। কেন যেন প্রচ্ছন্ন হিংসায় ওকে অধীর ক'রে তোলে। বহুদিনের নির্যাতিত যৌন-জীবন উদগ্র হয়ে ওঠে। প্রথম দাবী ওর, কিন্তু ও তো কাল রাত্রেই প্রত্যাখ্যান করেছে। মূঢ়া নারী—নিজের হস্তগত ঐশ্বর্য, বিলিয়ে দিচ্ছে অপরকে।

মনের ভিতর একটা রোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে নিজেকে পীড়ন করতে। জর্জরিত করতে নিদারুণ কশাঘাতে।

বলিষ্ঠ কিশোর—বলিষ্ঠ বাহু, বলিষ্ঠ পেশা। এখনও গোঁফের রেখাটি পর্যন্ত পরিস্ফুট হয়নি। এর দেহ ভোগ করায় একটা আনন্দ আছে।

বেদিনী ময়না বাঘিনীর মত লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারপর কি ভেবে যেন চাচার নায়ের দিকে ফিরে চলে। এখনও শিকারের সময় হয়নি।

রাত্রি গাঢ় হলে সে যাবে···

নয়ন ভাবে আজও শুথ আসবে—

তাঁবুতে গিয়ে সে চোখ বুঁজতে পারে না।

রাজা সাহেবের নৌকায় একটা লোক এসেছে কুটুম্ব বাড়ির সংবাদ নিয়ে। বিয়ের উৎসব কালই সারা করতে হবে মেয়ের বাপের। কারণ তারা নাকি তাদের বহর খুলে অন্য কোথায় চলে যাবে। শুধু এই জন্য তারা দিন নষ্ট করে থাকতে পারে না। এমনিতেই তাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে।

বিয়ে হয়ে গেছে নীরবে। উৎসবটা হবে জমকাল ভাবে। তাই যদি না হয় তবে আর বিয়ে দিয়ে ফয়দা হলো কি! জামাই এবং আত্মীয় স্বজন তো জানল না কেমন ঘরের মেয়ে এনেছে তারা। রাজা সাহেবের অর্থ আছে। তা দিয়ে তো মনের অহংকার চরিতার্থ করতে হবে। বিশেষ করে তারা আরব বেদুইন। তাদের চালচলন সব বাদশাহী কায়দায়। এদেশী নেয়ে বেদের মতো নয়।

তখনই হুকুম হয় যোগাড় করো—কালই হবে উৎসব—কেন পারবে না রাজা সাহেব—তার পক্ষে এমন একটা কঠিন কি!

যে সংবাদ নিয়ে এসেছিল সে ফিরে যায় খেয়ে-দেয়ে।

এখন উনপঞ্চাশখানা নৌকা থেকে ভেট বেগার আসতে থাকে রাজা সাহেবের নায়ে।

একদল লোক চলে মদ জ্বাল দিতে। ঐটাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

গোলমাল হৈ-হল্লায় আর কে ঘুমাবে—নয়ন উঠে পড়ে দলে মিশে যায়। সে উৎসুক হয়ে কয়েকবার রাজা সাহেবের নৌকায় আসে। কিন্তু বারবারই দেখা হয় ময়নার সঙ্গে।...

চোরাই বামাল ও টাকা কড়ি ভাগ হচ্ছে ··

রাজা সাহেব চোখ রাঙিয়ে ওঠে—এখানে নয়ন কি চায়?

ময়না চাচাজীকে থামায়। সেই সময় শুখ যেন নৌকার অন্য খোপ থেকে একবার মুখ বার করে—মুহূর্তের জন্য। নয়ন এসে ময়নার কাছে ঘেঁসে বসে। এসব কি? এরা কি তবে ডাকু?

সোনা রূপা থেকে মুরগী হাঁস পর্যন্ত কিছুই এরা বাদ দেয় না। গ্রামে যায়

ওঝালি বৈদ্যালি করতে, কিন্তু গৃহস্থের অলক্ষ্যে যা হাত সাফাই ক'রে আনতে পারে তা তো আনেই—রাত্রে এরা দল বেঁধে ডাকাতি করতেও নামে। নইলে দিনের আলোতে এত বড় বড় সব কাঁসা পিতলের জিনিস, সোনা রূপা সরিয়ে আনা অসম্ভব। নয়ন স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

জিনিসপত্র সব ভাগ হয়েছে, কিন্তু একটা দামী আংটি পাওয়া যাচ্ছে না। ময়না সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে কাপড়ের আঁচলে ঝাড়া দেয়।

তুই অমনটি করিস না—ব'স বেটী। কোন্ হারামী যেন হাত মেরেছেক। হামি তাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবেক। ব'স বেটী, তুই ব'স।

নয়নের মুখ ম্লান হয়ে যায়।

তুই হাঁস-ফাঁস করছিস ক্যান্ বেটা? তুই তো কুটুম আছিস।

বহরময় একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়।

যারা মদ জ্বাল দিতে জংগলে গিয়েছিল তারাও ছুটে আসে।

কিন্তু আংটিটা পাওয়া যায় না। দামী লাল পাথরের সোনার আংটি।

এমন সময় একদল পুলিশ আসে। সমস্ত গোলমাল জল হয়ে যায়। রাজা সাহেবের জংলি গলা মোলায়েম হয়ে আসে। মেয়েলোকেরা সব নৌকায় গা ঢাকা দেয়। টপাটপ বামালগুলো সব গায়েব করে ফেলে এদিক-ওদিক।

রাজা সাহেব তামাক খাওয়ায়—মেয়ের বিয়ের নজর দেয়।

পুলিসেরা তবু ওঠে না। তখন যাদুকরীরা গালগল্প করতে থাকে। একটি একটি ক'রে সব ক'খানা নৌকার দুয়ার খুলে যায়।

দারোগা সাহেব দলের কর্তা—খাঁকি কোর্তা গাদানো—যেন বুড়ো পয়গম্বর।

সার্চ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাজা সাহেব সবই বুঝতে পারে—এ তো আর কিছু নয়! এই খানি টানতে টানতেই সে বুড়ো হলো। একটা নৌকার শেষ খোপে নিয়ে যায় দারোগা সাহেবের হাত ধ'রে। যেন কত মহব্বৎ!

রাজা সাহেব ফিরে এসে যারা বাইরে বসে ছিল তাদের আবার তামাক খাওয়ায়, কিন্তু তাতেও যে তারা তুষ্ট নয় তা বেশ বোঝা যায়। রাজা সাহেব কি করবে! সে হেসে তার জংলি ভাষায় চৌকিদার দফাদার নির্বিশেষে সকলকে আশীর্বাদ করে যে তোমরাও দারোগা হও।

রাজা সাহেব নিজের নৌকায় ফিরে এক লোটা পানি খায়। খানিকটা পান সুপারি কুচিয়ে থেতলে দেয় ময়না। রাজা সাহেব চিবুতে থাকে।

ময়না প্রশ্ন করে, কোথায় গেলেক হারামী ?

বুড়া কুত্তির লায়ে।

তোমারা এসব কাম ছাড়ো চাচাজী।

মাঝিরা খাবেক কি ? জমিখেতি আছেক ?

ময়না বোঝে কথাটা ঠিক।

প্রথম প্রথম তো এরা নৌকায় ক'পুরুষ ওঝালি বৈগ্যালিই করেছে। তারপর বংশ বাড়ল। সেই অনুপাতে তো সব কিছু বাড়ে নি, উপায় কি ?

ময়না একটা নিশ্বাস ছাড়ে।...

পুলিসের দল কিছুক্ষণ বাদে নৌকা ছেড়ে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ছলবল ক'রে ওঠে নাইয়া বেদের দল। যে যার কাজে চলে যায়। কি ক'রে মদ চোলাই করে তাই দেখতে যাবে ভেবেছিল নয়ন, কিন্তু দারোগা সাহেবের কাণ্ডকারখানা দেখে ওর মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে ওঠে। ঘৃণা হয় ময়নাদিদির ওপরও। সে-ও তো এদের ঘরেরই মেয়ে!

নয়ন স্থির করেছিল এদের একজনের কাছ থেকেই সাপখেলা শিখে নেবে। বিষাক্ত কেউটে ধ'রে ফেলবে এক মুঠো ধুলো ছড়িয়ে—জ্যান্ত জংলা কেউটে! কিন্তু তা হয় না। এদের সংস্রব কাল সকালেই তাকে ত্যাগ করতে হবে। ময়না না যায়, সে একাই ফিরে যাবে তমালতলা।

ওদের চোখে মধু, বুকে বিষ—ঘৃণ্য এবং জঘন্য ওরা।

সমাজ জীবন কি পংকিল!

বুইনদিদি তুমি কি করবা? আমি কালই বাড়ি যামু।

হামিও যাবেক—কিন্তু চুপ—হরবর করলে দিবেকনি জমায়েত ভেঙে যেতে।

ক্যান্? কে রাখবে ধইরা?

রাজা সাহেব, কন্যার বাপ। দোষ লাগবেক নাউরী কন্যার—সে ভারী দোষ! তারপর একটু ইতস্তত করে বলে, তুই শুত্‌বিনি। চল্ ঘুম যাবি, রাত নেই আর।

তাঁবুতে ঢুকে ময়না চোখ রাঙিয়ে ওঠে, কে, হারামজাদী খান্‌কি? কে লা এখানে? ভাগ্ ভাগ্ কুত্তি।

একটি মেয়ে ম্লান মুখে ছায়ার মতো বেরিয়ে যায়।

অন্ধকারে নয়ন ও ময়না দু'জনেই চিনতে পারে।

রাজ সাহেব ছুটে আসে। কি রে বেটী?

শুধ।

রাজা সাহেব ফিরে যায়।

একটা আর্তনাদ শোনা যায়—বিষণ্ণ, অথচ তীক্ষ্ণ।

ময়না মুহূর্তের জন্য একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলে, চল্‌রে নয়ন চল্—দেশে যাই। হামার পরানটা বড় খাঁ খাঁ করছেক।

অন্ধকারেই তারা তাঁবু ছেড়ে বার হয়।

নয়নের পায় যেন একটা কি ঠেকে, সে কুড়িয়ে নেয় জিনিসটা।

পথ চলতে চলতে নয়ন বলে, একটা জিনিস পাইছি।

কি?

এই যে দেখো না।

এ তো সেই আংটিটে। কে দিলেক? কোথা পেলি?

আসার সময় তাঁবুতে।

মাগী চোর আছেক।

কে বুইনদিদি?

এখন ওর কথা রাখ্—পা চালিয়ে চল্। রাজাসাহেবের যে গোসা! দে হামার ঠাঁই আংটিটে।

তখনও শুক তারাটি নীলাকাশে ছলছল করছে।

[সতের]

গোপীনাথ ইতিমধ্যেই পদ্মদীঘির চরের বড় বড় গাছ ক'টা ভূমিস্মাৎ করেছে। ময়না নেই—থাকলে আবার কিসে কি হয়—এই সুযোগেই শুভ কাজ শেষ করা ভাল। মামীর সঙ্গে শাখাপ্রশাখা এবং কাণ্ড নিয়ে দু'দিন তিন চার দফা প্রচণ্ড ঝগড়াও হয়ে গিয়েছে। ফলে মামী কয়েকবার বাপের বাড়ি যাওয়ার হুমকি দেখিয়েছে। মামাও কম করেনি—কাশীবাসী হবে ব'লে শয়নার চর পর্যন্ত গিয়ে একটা মস্ত শোল মাছ কিনে নিয়ে ফিরে এসেছে। মাছ দেখে কেউ যদি মনে করে মামার মত্ বদলেছে—সে নিতান্ত ভুলই করবে। তবে কিনা একবার কাশীবাসী হ'লে তার তো আর ফেরার কোন বাঞ্ছা নেই—তাই মাগীকে শেষ আমিষ আহার করাতেই নেহাৎ এসেছে। মামী বুঝুক আর না-ই বুঝুক—ও-ই তো বুড়ো গোপীর নয়নতারা—সখি, সচিব, সখা!

রাত্রে একবারেই নিয়ে-থুয়ে পাশাপাশি আহার করতে বসেছে দু'জনে।

কেমন ভাল করি নাই? গাছগুলা যদি না বেচ্তাম—মাগী তো আইসা পড়বে ঘোড়ার পিঠে চইড়া—আমি কি একটা পয়সাও পাইতাম! তোর তো বুদ্ধি নাই, খালি ঝগ্ড়া। এখন মাছ খায় কেডা, লাগে কেমন?

মোন্দ না!

এয়া কি গোপীনাথ নিজে কোনদিন রোজগার কইরা খাওয়াইতে পারছে—আষ্ট আনার একটা মাছ?

আমি তো কইছিলাম গাছ বেইচা খালি ডালপালাগুলা রাখো। নিত্য নিত্য নয়নডা যায় কাঠের অভাবে পদ্মদীঘির জংগলে—আমার লতাপাতার ভয় করে।

তোর তো চিরদিনই দেখলাম মামার থিকা ভাইগ্নার উপর টান বেশি। এখন বাড়িময় ধান ওঠবে—খ্যাশবিত্যাশের লোক আইবে—তুই একটু সইম্‌ঝা চল্‌।

খ্যাশবিত্যাশের লোক আইবে ক্যান্‌? বর্গাভুঁইর ধান দেখতে—না বুড়াকালে নিকা বইবা?

পুরুষে কি নিকা বয় নাকিরে—যেমন বুদ্ধি তোর!

কি না তেজের পুরুষ্‌!

তা কইতে পারিস—এখনও একটা পোলা হইল না, ক্যাবল একটা মাইয়া! এতদিন দুঃখ হয় নাই—এখন এউক্কা হইলে পারত। খ্যাখ্‌রে নয়নতারা, কত কষ্টে দিন গেছে—দিন মানুষের একদিন ফেরে, কিন্তু বয়েস ফেরে না।

ক্যান্‌, দুঃখ করো ক্যান্‌—নয়নই তো রইছে।

মামা রেগে ওঠে। হইছে, হইছে!

এমন সময় বাইরে নয়নের কণ্ঠ শোনা যায়। মামী, আমি আইছি।

দু'জনেই জড়সড় হয়ে পড়ে। মামা রাগ করে খানিকটা মাছ পাতে রেখেই উঠে আঁচাতে যায়। একটু সুস্থ হযে দু'টো ভাতও মুখে দেওয়ার জো নেই। দিগ্‌বিজয় করে এসেছেন যেন! এখন আবার রাঁধে কে? একটা বেলা দেরি ক'রে এলে আর হতো কি?

মামা, ময়নাদিদি তোমারে যাইতে কইছে।

ক্যান্‌রে—গাছ-টাছের কথা কিছু কইছে নাকি?

না। এম্‌নে কি জানি কথা আছে।

এখনই যামু নাকি? আমার পাঞ্জাবীটা দেও তো!

না মামা, কাইল সকালে গেলেই হইব।

কিন্তু গোপীর পক্ষে রাত্রে গেলেই ভাল হয়। নানা দুশ্চিন্তায় সে চোখই

বুজতে পারবে না। এমন কি জরুরী ব্যাপার যে এসে উঠতে না উঠতেই তাকে সংবাদ। নয়নটার গাঢ় বুদ্ধি নেই। থাকলে ও-ই তো জেনে আসতে পারত সব। আর এ-সংসারের ভাল মন্দর জন্য তো ওর বড় মাথা ব্যথা! সকল দায়িত্বই গোপীর। সে হেউলী-হোগল বেচেছে, গাছপালা কেটেছে—এসব এসেই বেদেমাগী টের পেয়েছে নিশ্চয়। কত টাকা আয় হয়েছে, কত টাকা জনমজুরিতে গেল তার একটা মনে মনে আসল ফর্দ ধরে গোপী। এবং সেই আসল ফর্দটা বারবার মনের পাতায় মুছে এমন একটা নকল ফর্দ তৈরী করে যাতে গিয়ে গোপীর ভাগে থাকে বার আনা মুনাফা আর চার আনা ময়নার।

বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে!

এইবার গোপী ঘুমাতে পারবে।

গোপী মনে মনে হাসে—একেই বলে গৃহস্থালি, যার পাঁজরে পাঁজরে 'উনলক্ষ' তালি!

হিসাব…শুধু হিসাব ‥

অনাথ গোপী শৈশবে কি ভাবে মানুষ হয়েছে জানে না। জ্ঞান হয়ে অবধি সে জ্ঞাতি বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। দু'বেলা দু'টো যে-ই খেতে দিক না কেন হিসাব ক'রে কাজ আদায় ক'রে রেখেছে। কেউ বাঁধিয়েছে গরু—কেউ কাটিয়েছে ঘাস—কেউ বা কাঁদুনে ছেলে কোলে দিয়ে নিজের সংসারী কাজ গুছিয়েছে! গোপীকে ঘর-বাড়ি পাহারায় রেখে কেউ বা স্ত্রীপুত্র নিয়ে দল বেঁধে যাত্রাগান, কবির ছড়া শুনতে গেছে। গোপীর সঙ্গে শুধু হিসাব, কাজের বদলে ভাত।

একবার জ্বর হলো গোপীর। প্লীহা-লিভারে পেটটা ভরা। নিত্য জ্বর আসে, কে ওর জন্য পয়সা খরচ করবে? কেই বা দেবে পথ্য-পানীয়, ওষুধ-বিষুধ তো দূরের কথা—সামান্য মুষ্টিযোগের পাচন জ্বাল দিয়ে দেওয়ারও তো বান্ধব নেই ওর! ও মরবে।

এমন সময় দেশের নাপিত কবিরাজ ওকে ডেকে নিয়ে গেল। কিছু কিছু ওষুধপত্র দিল বটে, কিন্তু ছাগল চরাতে হলো ওর এক কুড়ি। রদ্দুর, বর্ষা, শীত,

গ্রীষ্মের বিচার নেই। জয়-বিজয়ের খেয়াল নেই। সেখানেও সে শুধু দেখেছে হিসাব। কাজের বদলে ভাত।

যখন ও ভাগে তাঁতের কাজ করা শিখল—তখন ওর তেমন একটা কি বয়স! কিন্তু ও তখন থেকেই একটি একটি ক'রে পয়সা—উপোস ক'রে অধেক খেয়ে- জমাতে আরম্ভ করেছে। খাঁ খাঁ রদ্দুরে চারদিক পুড়ে যাচ্ছে, হাট থেকে ফিরতে খোলা মাঠে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়। কত লোক দু'একটা তরমুজ কি অন্য কোন ফল-ফলাদি খেয়ে বুকটা ঠাণ্ডা করছে, কিন্তু গোপী তৃষ্ণার্ত্ত অন্তরকে বলেছে—একটু সবুর, আর একটু।

সেই হিসাবের জোরেই সে একখানা তাঁত কিনেছে। বসতবাড়িতে ঘর-দোর তুলেছে—বিয়ে ক'রে এনেছে নয়নতারাকে আড়াই কুড়ি টাকা কন্যা-পণ দিয়ে।

গোপী জীবন ভ'রে শুধু হিসাবই দেখেছে—সেই হিসাবই সে করেছে—এখন শিখতে বলছে নয়ন ও তার মামীকে।

এ তো হিসাব নয়—এ একটা মন্ত্র—যে মন্ত্রের বলে সামান্য একটা অনাথ হ'তে পারে সাত সাত বিঘা ধানী জমির মালিক।

হিসাব তো না মন্ত্র—গোপীর চোখে গাঢ় ঘুম নেমে আসে।

সকাল বেলা উঠেই গোপী সকলের আগে সাজসজ্জা করে—তারপর ঈশ্বরের নাম নেয়।

মামীকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসা করে, একটা কথা—কাইল নয়নতার গায় একটু তুলসীর ছিঁটা দিছিলা?

ক্যান্—ওর কি হইছে?

কয় রাত্তির বাইন্থা মাগীর সাথে কাটাইয়া আইছে কিনা!

বড় দেখি বাছ-বিচার! তারপর গোপীর স্বভাব সম্বন্ধে একটা কঠোর মন্তব্য করে। নিজের দিকে চাইয়া কথা কও না! তুমি তো তেরাত্তিরও—

গোপী কানে আঙুল দেয়। শ্রীবিষ্টু! শ্রীবিষ্টু। একদিকে রওনা দিছি শুভকাজে—

আমিও তো সকাল বেলা শয্যা ছাইড়া উঠছি। ছ্যামরারে তুমি দেখতেই পার না!

গোপী মনে একটা অশুচি ভাব নিয়ে রওনা হয়। আজ একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটা অনিবার্য।

ধান-পান দু'একটা বছর উঠুক। গোপী একটু হাঁপ ছেড়ে নিক। তারপর নয়নকে জুতিয়ে এবাড়ির সীমানা থেকে পার করবে। সেই সঙ্গে মামীর মাথায়ও ঘোল ঢেলে বিদায় করবে। গোপীরটা খেয়ে, গোপীরটা পরে—টান টানবে একটা বদমাসের। ছোকরার বয়সটা কি, কিন্তু এর মধ্যেই কেমন ইঁচড়ে পেকেছে।

ওরে মাগী, ও ইঁচড়ের কোষে মধু জম্মে না!

গোপী হন্‌হনিয়ে পদ্মদীঘির পাড়ে এসে পড়ে।

আদাব বৈছ্যির ঝি—আদাব।

ময়না জিজ্ঞাসা করে এ ক'দিন ভৈরব এদিকে এসেছিল কিনা? এবং এসে থাকলে সে কি কি বলে গেছে?

গোপীর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

যদিও একদিন মাত্র ভৈরব এসেছে, কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করেনি গোপীকে। শুধু বন্ধ বাসাটার দিকে চেয়ে সে ফিরে গেছে। কিন্তু গোপী নানাবিধ প্রণয়-বাচক বিশেষণ দিয়ে ময়নাকে যে সে খুঁজেছে এবং তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এই কথাটাই বোঝায়।

তা হ'লে সাধু তার আজও আসবে!

ময়না গোপীকে বিদায় দেয়।

গোপী যেতে যেতে ভাবে—

এ শালাশালীদের হিসাব নেই মোটে। স্থানকাল পাত্রাপাত্র না বুঝে—

লাভ লোকসান না খতিয়ে, যার তার সঙ্গে যে-সে একটুতেই মজে। এ রকম বেহিসেবী হ'লে তাদের আর উন্নতির কোন আশাই নেই। এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই!

[আঠার]

জ্যোৎস্না—মধুর জ্যোৎস্নায় ডুবে গেছে তমালতলার পদ্মদীঘী। রকমারি জ'লো ফুল তেমন কিছু গন্ধ না ছড়াক, রূপের পসরা মেলে দিয়েছে চাঁদের আলোতে। চারপাশের তাল তমাল আমলকী তা চেয়ে চেয়ে দেখছে। তাদের কারুর মাথায় জংলা ফুলের উষ্ণীষ, কারুর মাথায় পরগাছার মুকুট। দু'একটা ভ্রমরও গুনগুন করছে পদ্মপাতার পাশে পাশে। ওপারের হেউলী ঘাস এপারের হোগলা ঝাড় যেন স্নান করছে চাঁদের আলোতে। ঝাড়ে ঝাড়ে কেয়াকাঁটা যেন শিউরে উঠছে এক দুর্বার আনন্দে। মানুষ দিনের বেলা যেখানে যেতে ভয় পায়, সেই গভীর জংলা অঞ্চলও যেন অপূর্ব হয়ে উঠেছে আজ। উপরে আলোর ইন্দ্রজাল, নিচে ছায়ার মায়া। দীঘির বুকভরা কালো জল টলটল করছে। জমিদার বাড়িটা নির্বাক। যেন এক স্বপ্নপুরী!

আজ রাজা সাহেবের মেয়ের বিয়ের উৎসব।...

ময়না ভৈরবের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। পরনে তার গেরুয়া শাড়ি, হাতে একতারা। সে একা একা বসে ভজন গাইছে। গানের ঝংকারে পদ্মদীঘির জলেও যেন ঝংকার জেগেছে। ঝোপে ঝাড়ে বসে রাত্রিচর ডাহুকী তা কান পেতে শুনছে। মাছেরা শিকারের পিছু পিছু ছুটছে না—পাছে গানের তাল কেটে যায়।

রাত্রি দুপুর, তবু সন্ন্যাসী আসেনি। ময়না যেন আকুল হয়ে উঠেছে।

সে বাসা ছেড়ে পদ্মদীঘির পাড়ে নামে। গান গাইতে গাইতে শ্বেত পাথরের ঘাটলায় গিয়ে বসে। কতদিনের ঘাটলা! এও তো এক রমণীর সংগীত—ঐশ্বর্য ও বাসনার কবিতা।

যেন সুরে সুর মিলে যেতে থাকে। অনুরণিত হয়ে ওঠে নহবৎখানা।

শিউরে ওঠে বকুল বীথি। এক একটি শিহরণ যেন ফুল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে বকুলতলায়—সুগন্ধি শিহরণ!

ভৈরব ফিরে এসেছে। শেষ হয়ে গেছে রাত। বংশীতলায় পূর্ণিমার উৎসব ছিল আজ।

ময়না, তুমি এমন সুন্দর ভজন শিখেছ!

কে, গোঁসাই? আর কথা বলতে পারে না সে।

এতদিন তুমি আমায় গোপন করেছ? যাক সুখী হ'লাম।

সাধুর চেয়েও যেন সহস্রগুণ বেশি সুখী হয় ময়না। সে নীরবে তার দেহমন ভ'রে সে সুখ অনুভব করে নিতে থাকে।

বাসায় যাবে না?

ময়না উঠে দাঁড়ায়।

কি, তুমি যে কাঁপছ?

ময়না যেন ভেঙে পড়ে! হামি বড় পাপী আছি গোঁসাই—বড় পাপ করেছেক।

প্রায়শ্চিত্ত তো তোমার হয়েছে—অনুশোচনা থেকে বড় কোন প্রায়শ্চিত্তই নেই। তুমি থামো। চলো, তোমাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

একরকম ভৈরবের দেহের ওপর ভর করেই ময়না চলে। ভৈরব ধীরে ধীরে এসে ময়নার বাসার সুমুখে থামে। এখন আমি যাই, কাল আসব।

ময়না শুয়ে শুয়ে একটা প্রগাঢ় শান্তি অনুভব করে। আজ তার সকল কামনা সকল বাসনা সার্থক হয়েছে। সে যে দুর্ব্যবহার করেছে তা তো সাধু কিছুই মনে রাখেনি! ভৈরবের উদারতায় সে মুগ্ধ হয়। যতটুকু

সময় সে তার দেহের ওপর এলিয়েছিল ততটুকু সময়ের মধ্যেই এমন একটা মধুর উত্তাপ অনুভব করেছে যে তা এ জীবনে সে কখনও উপলব্ধি করেনি। একটা সুগন্ধও সে পেয়েছে যেন। হঠাৎ তার মনে চাঞ্চল্য আসে। কেন, কিসের জন্ম এ চঞ্চলতা তা সে সঠিক কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু নেচে নেচে ওঠে তার শিরাপ্রবাহিণী, সে গুনগুন করে রাত কাটিয়ে দেয়।

সকাল সকালই ময়না ঘুম থেকে ওঠে। সে তার গেরুয়া শাড়িখানা হাতে নিয়ে ঘাটলার দিকে যায়। মনে তার প্রচুর আনন্দ। রাজা সাহেবের বহরে গিয়ে যে ক্লেদ এবং পংক তার মনে জমেছিল তা যেন মুছে গেছে সাধুর পবিত্র স্পর্শে। তার মানস সরোবরে যেন অজস্র পদ্ম ফুটিয়েছে ভৈরব, তাই তো ধুয়ে গেছে যত পংকিলতা। সে আরও শুদ্ধ হবে স্নান ক'রে গেরুয়া বাস পরে।

সে জলে নেমে অবাক হয়ে যায় তার কালো দেহের প্রতিবিম্ব দেখে। গর্বিতা হয়ে ওঠে তার ভিজা চুলের ভারে। শিউরে ওঠে তার বক্ষের লাবণি লক্ষ্য করে!

এমন ক'রে ময়না নিজেকে কোনদিন উদ্ঘাটিত ক'রে দেখেনি। এক কোমর জলে এসে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়—বন্ধ করে দেয় ঢেউ ছড়ান। এক গোছা রজনীগন্ধার মতো সে নম্রত হয়ে চেয়ে থাকে জলের দিকে। জল তো নয় যেন একখানা স্বচ্ছ আরশি—যার বুকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এক চঞ্চলা যাযাবরী।

একটা হাসি শোনা যায় অদূরে।

অমনি শাড়ির আঁচল গায় লেপটে দেয় ময়না।

ওপার বেয়ে দু'টি মেয়ে আসছে তমালতলার দিকে। এদের যেন চেনে বেদেনী। কবে যেন কোথায় দেখেছিল! হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই বংশীতলায়।

ঐতো সেই বেহায়া মেয়েটি আসছে আগে আগে, তারপর দ্বিতীয়টি, যে বসতে যত্ন করেছিল ময়নাকে। পিছনে একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব।

এরা এদিকে কেন এসেছে? যাবেই বা কোথায়? অত ঢলে ঢলে টলে টলে কি আনন্দ সংবাদ ব'য়ে নিয়ে চলেছে? পদ্মদীঘির পাড় দিয়ে অমন

ক'রে কেউই তো আজ পর্যন্ত যেতে সাহস পায়নি। ওরা চেনে না ময়নাকে!

সে ইচ্ছা করলে নিমিষে স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে প্রগলভতা—এ গাঁয়ের সবাই জানে সে অত চটুলতা ভালবাসে না!

পুকুরপাড় বেয়ে আর একটু এগিয়ে এসে শ্যামলী বলে, ঐ তো রে সেই বেদেনী। ডেকে একবার জিজ্ঞাসা কর্ না চন্দ্রা। সাধুকে সাপের খেলা দেখিয়ে এসে বুঝি স্নান করছে।

তুই বড় বেহায়া, যার তার সঙ্গে যখন তখন ফাজলামি—ঘা তো খাসনি এখনও! চন্দ্রা শ্যামলীকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, চল্ চল্ এগিয়ে।

দেখেছিস, আবার গেরুয়া বাস পরেছে—কত রঙ্গ জানো মা-কালী! শ্যামলী ধীরে ধীরে চন্দ্রার কানের কাছে মুখ এনে বলে, সেরেছে, বেদেনী মাগী নিশ্চয় মজেছে।

তাতে তোর বুক টাটায় কেন?

টাটায় নানা কারণে। গ্রাম্য সম্পর্কে ভৈরব শ্যামলীর দাদামশাই। ভৈরবের আশ্রম তমালতলা, শ্যামলীর বাপের বাড়ি বংশীতলা। ওরা এদেশের গৃহস্থ বৈরাগী। ভৈরব অল্প বয়েসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। শ্যামলী বিধবা হয়েছে বিয়ের পরই। দু'জনের মধ্যে সখ্যতা ছিল খুব। শ্যমলী ভৈরবের ওপর আকৃষ্ট হয়। সে কোন উপায়ান্তর না দেখে তাকে বলে ভজন শিখতে। বলে, দেহমন সমর্পণ করে দিতে প্রেমময়কে।...

তারপর একদিন ঘটনাচক্রে একটি নবীন সন্ন্যাসী আসে বংশীতলায়। নাম ধ্রুব।

পথিক সন্ন্যাসী যাবে তীর্থে। কিন্তু সমস্ত তীর্থের স্বপ্ন দেখে শ্যামলীর ভ্রমরকৃষ্ণ ডাগর চোখে। বিশ্রামের অছিলায় সে পূর্ণ একটি পক্ষ কাটিয়ে দেয় সেখানে।

বাড়ির সবাই যখন ভিক্ষায় বেরিয়ে যেত, চন্দ্রা বিব্রত থাকত গৃহকর্মে, সন্ন্যাসী

তখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত শ্যামলীর ফুল তোলা, মালা গাঁথা, এদিক ওদিক যাওয়া আসা।

প্রথম শ্যামলী এ সব লক্ষ্য করেনি, অবশেষে একদিন টের পায়। সে চিরদিনের মুখরা। চট্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, কিগো ঠাকুর, গিলবে নাকি? অমন করে যে চেয়ে রয়েছ?

শ্যামলীর কথায় ধ্রুব এমন লজ্জা পায় যে, সে আর প্রতিউত্তর দিতে তো পাবেই না, বরং চেষ্টা করতে থাকে তখনই বংশীতলা ছেড়ে কেমন করে পালাবে।

নতুন সাধু, নতুন ঝুলি, সবে পা ফেলেছে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে। তাড়াতাড়িতে হারিয়ে ফেলে ঝুলি ও নামাবলী।

কি খুঁজছ ভক্তদাস?

ধ্রুব আবার রাঙা হয়ে ওঠে।

ঐ তো তোমার ঝুলি, তোলা রয়েছে বাঁশের মাচায়। কিন্তু যাচ্ছ কোথায়? বাড়ি আসুক সবাই।

সবাই বাড়ি এলে যে এই মেয়েটি কি করবে এবং কি যে বলবে তা ভাবতেই পারে না ধ্রুব।

কিছুক্ষণ বাদে সে বলে, অনেকদিন তো গত হলো—এখন আমি যেতে চাই।

শ্রীরাধাকে না বলে কয়ে? পুরুষজাত বড় বেইমান!

শ্যামলী! চন্দ্রা ডাকে। কি হয়েছে তোর? দিন দিন কি বিদ্যা বাড়ে? বিদেশী লোক, রয়েছে ক'দিনের জন্য, তুই তাকেও তিষ্ঠাতে দিবিনে?

তুই তো জানিস নে, আমাকেই পাগল ক'রে তুলেছে।

কারুর মনে দুঃখ দিতে নেই শ্যামলী, ওর ফল ভাল হয় না—পদে পদে ঈশ্বর আমাদের তা দেখান।

নিষেধ নয়, শাসন নয়, ব্যংগও করে না চন্দ্রা। শ্যামলী থামে। তারপর যে ক'দিন ধ্রুব ছিল শ্যামলা তাকে যে কিছু বলেছে তা কেউ শোনেনি।

যাওয়ার দিন ধ্রুব বারবার কাকে যেন খুঁজেছিল, কিন্তু সে বুঝে-সুঝেই ছিল অনুপস্থিত। চন্দ্রা বলেছিল, শুধু দু'টি মিষ্টি কথা বললে আর অশুদ্ধ হয়ে যেত না মহাভারত।

যেখানে দরকার নেই সেখানে মধুও অপকারী। শ্যামলীর জবাবে চন্দ্রা একটা প্রগাঢ় ভাব লক্ষ্য করে।

ভৈরবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর আবার জড়তা কেটে যায়। তরল হয়ে আসে তার মতি। সে মতিভ্রম ঘটাতে চায় সাধুর। ভৈরবের সন্ন্যাসী জীবনের ওপর তার কোন শ্রদ্ধা নেই, সে তাকে চায় গৃহী কুমারের মতো।

যেন বিশেষ কেউ যাচ্ছে না, অনেক তুচ্ছের পাত্রী এরা ময়নার কাছে, এমনি একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে সে চন্দ্রা ও শ্যামলীর পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

দেখলি গরব চন্দ্রা? শ্যামলী একটা গানের কলি আওড়ায়—

যদি তোমার গন্ধ থাকতো ওগো কালো ধুতুরা গো…

চন্দ্রা সুর ক'রে জবাব দেয়—

কাঁটা কেয়ার কিবা দাম
ভোলার সভায় নাই তার কোনো নাম
জেনে শুনে একি বলো
সাধু সোহাগী শাদা পেত্নী গো…

চুপ কর্ চন্দ্রা, আর কবিয়ালী করতে হবে না মাঝপথে। এখন তোকে শাসন করে কে?—শ্যামলীর প্রাণে যেন একটা আঘাত লেগেছে। সত্যি সত্যিই সে তো আর কারুর সোহাগিনী নয়। যদি হ'ত তবে না হয় সইতো এ সব টিটকারী।

ওদিকে ময়না সঠিক কিছু শুনতে পায়নি, কিন্তু তার অন্তর মিছামিছি দাউ দাউ ক'রে ওঠে। যতক্ষণে ওরা না গাছগাছালির অন্তরালে অদৃশ্য হয়

ততক্ষণ সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দীঘির পাড়ে। কি যেন বুদ্ধি আঁটে মনে মনে।

ময়না বোঝে ওরা গিয়ে উঠেছে ভৈরবের বাড়িতেই।

চন্দ্রা ডাকে, ভৈরব!

ভৈরব বেরিয়ে এসে প্রণাম করে বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে।

গুরু মঙ্গল করুন, মতি রাখুন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে! আমি আর দাঁড়াবো না, বিশেষ কাজ আছে। বেলা না চড়তে চড়তেই আমি যেতে চাই। ওরা বেড়াতে এলো বাবাজীর আশ্রমে।

আপনি যদি অপেক্ষা না করেন তা হ'লে রোদ চড়ার আগেই যাওয়া ভালো। কিন্তু এ বেলাটা কি বিশ্রাম ক'রে গেলে হ'ত না?

না, না, বাবাজী, আর একদিন। তুমি তো শুধু বৈরাগ্যই ক'রে গেলে, আমাদের পথ আরও দুর্গম, আরও জটিল। ভোগের ভিতর দিয়ে ত্যাগের পথে চলতে হচ্ছে। আজ তা হ'লে উঠি।

বসলেনই তো না।

শালগ্রামের সবই সমান! আজ নয়, আর একদিন। বৃদ্ধ দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়।

তারপর, হঠাৎ তোমরা যে?

শ্যামলী একখানা পিঁড়ি টেনে বসে প'ড়ে বলে, চম্‌কে দিতে।

ভৈরব স্মিত মুখে জবাব দেয়, তা পারো বটে!

এখন ওসব রেখে বলো, ঘরে কি আছে—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে আমার। পথ তো একটু-আধটু নয়।

তবে রোজ রোজ বেচারীকে যেতে বলিস কি ক'রে?

থাম্, তোর আর ওকালতি করতে হবে না চন্দ্রা।

আলবৎ করতে হবে। আসামী আমার গরীব, মুখে রা'টি নেই!

কি বল্লি ? তোর আসামী ? কেন, আর কারুর হ'তে পারে না ? উকিল কি তুই একা ?

তবে তোর নাকি ? কি গো ঠাকুর, কার ?

শ্যামলী বলে, ও জবাব দেবে না ! ও তো আমাদের আসামী নয়।

তবে ?

ভ্রূ জোড়া বাঁকিয়ে শ্যামলী চন্দ্রার কথার উত্তর দেয়। আসামী আমাদের নয়—ময়নার।

ভৈরব বলে, শ্যামলী, এটা আশ্রম !

চন্দ্রার খেয়াল হয়, চুপ করে সে। কিন্তু শ্যামলী জবাব দেয়, প্রসংগটাও সাধু।

তবে যা ইচ্ছা বলো, আমি এখান থেকে যাই। ভৈরব এমন একটা ভাব প্রকাশ করে যা অন্তত তার বাড়িতে বসে সদ্য আগন্তুক অতিথি কামনা করেনি। শ্যামলী আহত হয়।

চন্দ্রা ধীরে ধীরে বলে, দোষ তো আমাদেরই।

হয়েছে, হয়েছে, তুই চুপ কর্।

চন্দ্রা আর কোনো প্রতি-উত্তর করে না। একটা বিশ্রি আবহাওয়া ফুটে ওঠে শান্ত আশ্রমে।

আশ্রম বলতে দু'খানা মাত্র ছনের ছাওয়া পুরানো ঘর। আসবাব অতি সামান্য। কয়েকখানা গেরুয়া কাপড়, ক'খানা ধর্মগ্রন্থ, আর রাধাগোবিন্দজীর যুগলমূর্তি। মেটে ঘর, বেশ পরিষ্কার উঠানটি। কৃষ্ণচূড়ার ফুলে শাদা উঠান লালে লাল হয়ে গেছে।

কিছু সময় পর্যন্ত চন্দ্রা উঠানের দিকে চেয়ে থাকে। দেখেছিস শ্যামলী, কেমন উঠানখানা ভ'রে গেছে রাঙা ফুলে। কতটুকু গাছ—

তোর ইচ্ছা করলে নাচ না, নাচ গিয়ে উঠানে। কেউ তো নেই, শাড়িখানা রেখে যা।

ওমা, আমি যেন ওকে মন্দ বলেছি। আমার ওপর অত রাগ কেন? আসার আগেও ছটফটানি—এসেও আবার আমার সঙ্গে কটকটানি! কেন, যা—যে বলেছে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করগে। আর এমন দোষেরই বা কি বলেছে ভৈরব?

শ্যামলী উঠে ঘরের ভিতর চলে যায়।

চন্দ্রা ঘুরে বেড়ায় উঠানে।

কিছুক্ষণ বাদে ভৈরব একখানা ডালায় ক'রে কয়েকটা পাকা পেঁপে, চাল-ডাল, তরি-তরকারি সের দেড়েক দুধ নিয়ে ফিরে আসে। সাধুর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখখানা এখন কতকটা স্বাভাবিক হয়েছে। চন্দ্রা, শ্যামলী কই? তাকে ডেকে খেতে দাও, তুমিও খাও।

তুমি না ডাকলে সে খায় কিনা সন্দেহ।

খাবে, খাবে—নিজের ওপর তুমি আস্থা হারাও কেন? ডেকে দেখো।

[উনিশ]

চন্দ্রা ডালাখানা নিয়ে ভেতরে চলে যায়। ফলমূল এবং চাল-ডালগুলো এক জায়গায় রেখে, দুধের পাত্রটা নামায়। ডালাখানা তুলে রাখে ঝেড়ে-ঝুড়ে।

দেখ্, তোর জন্য সাধু কতো কি এনেছে শ্যামলী। দুধ জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি খা।

শ্যামলী সাধুর শয্যায়ই শুয়ে ছিল, বলে, না। এখন আর আমার ক্ষিধে নেই।

চন্দ্রা জবাব দেয়, খালি শয্যায় শুলেই যদি ক্ষিধে মরে থাকে, তবে আর এতো দাপাদাপি ক'রে এখানে এলি কেন? ওঠ্—তোর বাপু সাহস কম নয়! ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবের বিছানায় না বলে-কয়ে শুয়েছিস্। এক্ষুণি ভৈরব এসে পড়বে। ওঠ্—উঠে বস্।

বলে-কয়ে ব্রহ্মচারীর বিছানায় শুলে বুঝি দোষ হয় না?

তা নয়। মোটেই উচিত নয় এমন শোয়া।

কৃষ্ণময় ভাবলে কিছু দোষ নেইরে চন্দ্রা, অসুস্থ রাধিকা বিছানায় কেন, কোলে শুতে পারে। গলা জড়িয়ে ধরলেও দোষ হয় না।

তোর সব তাতেই বড্ড বাড়াবাড়ি। এখন ওঠ্, দুধ জ্বাল দিয়ে দি। দেখ্ছি বেদেনীর চাইতেও তোর ওপর টান বেশি। বেদেনী সাধুকে খোঁজে, সাধু তোর জন্য পাগল।

কি ক'রে বুঝলি?

ঘন দুধ দেখে—দুধের ওপর প্রেমের ননি জমেছে।

দূর আভাগী!

এখন ওঠ্, হয়তো ভৈরব এসে পড়বে, হাত পা ধুতে গেছে।

কি বা শয্যা! একখানা চটের ওপর সামান্য একটা গেরুয়া চাদর মাত্র। তাই শীতলপাটির মতো লাগে শ্যামলীর কাছে। সে শয্যা ছাড়তে চায় না। সে ঠিক জানে যে ভৈরব দেখলে অসন্তুষ্ট হবে, তবু সে ওঠে না। চন্দ্রা হাত ধ'রে টানাটানি ক'রে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়। বেলা কম হয় নি!

মানুষকে জ্বালাতেই তোর জন্ম।

আর আমাকে জ্বালাতে বুঝি কেউ জন্মে নি?

চন্দ্রা আর উত্তর দেয় না।

শ্যামলীর ভিতর কাম ক্রোধ লোভ মোহ কে দিয়েছে? কে এনেছে বাসনার বারুদখানার কাছে সন্ন্যাসের দ্যুতিময় স্ফুলিংগ বিকাশ? কে এনেছে মরুভূমির কাছে জলভরা মেঘ? কে? কে? শ্যামলী উঠে বসে।

ভৈরব ঘরে ঢোকে।

শুয়ে আছো শুয়ে থাকো। বিশ্রাম করো—একটু পরেই না হয় উঠো। যা হবার তা হয়েছে। এখন উঠলেই তা আর খণ্ডানো যাবে না।

শ্যামলী তবু উঠে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়। সে ভৈরবের কথায় কান দেয় না।

তুমি কি কিছু খেয়েছো শ্যামলী?

শ্যামলী দাঁড়ায়। বলে, মা, খাইনি।

কেন? এই যে বললে ক্ষুধায় অস্থির তুমি!

যা এনেছো তাতে পেট ভরবে না—বেদেনীর মাথাটা চাই।—শ্যামলী অদৃশ্য হয়।

ভৈরব স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

একথা সত্য, না ব্যঙ্গ অনেক চিন্তা করেও ভৈরব বুঝতে পারে না। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থেকে বিছানার চাদর এবং চট্‌টা নিয়ে পদ্মদীঘির দিকে যায়। ঘাটলায় নেমে ওগুলো ধুয়ে নিজে স্নান ক'রে ওপরে ওঠে। সে

মনে মনে বলে, ঠাকুর, যারা অজ্ঞান তাদের জ্ঞান দাও। যেমন শ্যামলী তেমনি ময়না। ওদের ওপর তুমি রাগ কোরো না।

গোঁসাই বিছানায় তোর কি হয়েছেক?

তুমি কোত্থেকে এলে ময়না?

আসমান থেকে। চাতক মেঘ দেখেছেক।—ময়না হাসে। সে শুধু গেরুয়া শাড়ি পরেনি। ফুলের মালা গলায় ও খোপায় পরেছে। হাঁসুলি পৈঁছি বাজুবন্ধ সে খুলে ফেলেছে—কেমনটি দেখাচ্ছে গোঁসাই?

সুন্দর!

যে অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখিয়ে ময়না চলে যাবে ভেবেছিল, তা সে পারেনি। তার বন্য মন ধকধক করে জ্বলে উঠেছিল চন্দ্রা ও শ্যামলীকে দেখে। একের অধিকারের মধ্যে কেন অপর আসবে? সে ঘরে এসে কাপড়-চোপড় রোদে দেয়। সাপ দু'টোকে খাওয়ায় মাছ এনে। আর যা তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ তাও সে করে একে একে। কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে পদ্মদীঘির পারে। যখন বৃদ্ধ বৈষ্ণব ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে হাত-ইসারায় ডাকে ময়না। বুড়ো সাহস পায় না অত উঁচু পাড় বেয়ে নামতে। সে দাঁড়ায়।

ময়না এগিয়ে যায়।

ওরা এখানটিতে ক্যান্ এসেছেক?

বেড়াতে।

কবে যাবেক?

দু'চারদিন বাদে, বৈষ্ণেরঝি।

আর কিছু ময়না জিজ্ঞাসা করে না; কোথায় কার কাছে এসেছে তাও না। সে সর্পিল পথে এঁকে বেঁকে যেমন উঠেছিল আবার তেমনি সাপের মতো ঘুরে ফিরে নেমে যায় নিচে। ওর চলন ও চাউনি ভালো লাগে না বৃদ্ধের কাছে।

দুপুর উৎরে যায় তবু ময়না রান্না চাপায় না, মহড়াও দেয় না কোনো গানের। পরে ভাবে এই গ্রামেই যখন সাধু আছে, তখন একবার আসবে

এখানে। না খেয়ে-দেয়ে এমন ক'রে সময় কাটিয়ে তার লাভ কি? ময়না রান্নার যোগাড়ে যায়।

খেয়ে-দেয়ে সে চুপচাপ থাকতে পারে না। সে ফুল সংগ্রহ ক'রে মালা গাঁথে। গয়নাগুলো খুলে রেখে নতুন ক'রে সাজে।

সাধু আবার বলে, সত্যই সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। এখন পথ ছাড়ো ময়না। শ্যামলী একবার ছুঁয়েছে, তুমি আবার আমাকে কষ্ট দিও না। বেলা হয়েছে অনেক।

কি ছুঁয়েছেক বেহায়া মাগী? বল্, হামি সমঝে দিবেক এখনি।

সে হয়তো খেয়াল করেনি·

খেয়াল তার মগজ কেটে বসিয়ে দিতে পারি হামি।

তুচ্ছ বিষয়, তুমি রাগ হবে কেন? রাগকে জয় না করতে পারলে তো কিছুই হবে না! পথ ছাড়ো ময়না।

ময়না সরে দাঁড়ায়।

আবার কখন আসবি গোঁসাই? হামি গোসা ছাড়বেক—তোর মনের মত হতে চাই। শিখিয়ে দিবিক তোর ঢং ঢাং এই বুনো মেয়েটাকে।

নিশ্চয় দেবো, তুমি ভেবো না—ভৈরব স্মিত মুখে চলে যায়।

বেদেনী চেয়ে থাকে। রৌদ্র দগ্ধ পথে যেন একখানা প্রশান্ত শুচি সাম্যমূর্তি অদৃশ্য হয়। একটু একটু ক'রে মিলিয়ে যায় আঁকা বাঁকা পথে। কিন্তু তারপরই অশান্ত কামনা তাকে বিবশ ক'রে তোলে। সারা দিন সে নিজেকে সুস্থ করতে পারে না।

ভৈরব বাড়ি ফিরে দেখে যে শ্যামলী একেবারে বদলে গেছে। সে খাবার নিয়ে প্রতীক্ষা করছে তার জন্য।

এত দেরী হ'ল যে? চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামলী জবাব দেয়, পদ্মদীঘিতে তো পদ্ম নেই, সিঙ্গারা কাঁটায় জড়িয়ে পড়েছিলো সাধু, তাই দেরি।

ভৈরব বলে, আমি ছাড়িয়ে এসেছি। আশা করি তুমিও এই শিক্ষা নিয়ে পথ চলবে।

শ্যামলী বলে, কাঁটা তো আমি ছাড়াতে চাইনে। কাঁটা দিয়েই আমার পথের কাঁটা তুলবো। এখন এসো খাবে।

দিনের বাকি সময়টা এক রকম কেটে যায়।

সন্ধ্যারতির পর ভৈরব বলে, একখানা ভজন গাওনা শ্যামলী।

ভালো লাগছে না।

সাধু তবু বারবার অনুরোধ করে। অবশেষে গান ধরে শ্যামলী। তার অমিয় কণ্ঠ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ময়নার কানে আগুন-গলানো টলটলে ধাতু কে যেন ঢেলে দেয়। ভৈরবের বাড়ি থেকে গান ও বাজনার রেশ ভেসে আসছে পদ্মদীঘি পর্যন্ত।

আর নয়। ময়না উঠে দাঁড়ায়। সে ভুলে যায় দুপুর বেলার প্রতিজ্ঞার কথা। আঁচলখানা শক্ত ক'রে জড়িয়ে পরে কোমরে। তার স্বামীর রাখা বহুদিনের সঞ্চিত কতটুকু পুরানো মদ বোতল ভেঙে ঢক্-ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলে। বেছে বেছে শাণিত টাংগিখানা টেনে আনে মাচার দুয়ার থেকে। কি এক কুটিল হাসিতে যে তার মুখখানা ভ'রে ওঠে! টাংগির ধারের মতো একটা নিষ্ঠুর হিংসার দ্যুতি যেন ঝক্‌মক্ করতে থাকে তার বুকের রক্তে।

বাসা খোলা ফেলে সে ছুটে চলে উর্ধ্বশ্বাসে।

সাপ-খোপ কাঁটা-জংগল তার পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হয়ে যেতে থাকে।

ভৈরব জিজ্ঞাসা করে, কে? কে?

শ্যামলী চীৎকার ক'রে ঢলে পড়ে।

ময়না টাংগি চালিয়েছে সজোরে।

বেশি উত্তেজনায় ভাগ্যক্রমে লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শ্যামলীকে রক্ষা করতে গিয়ে খানিকটা হাত কেটে গেছে ভৈরবের। তার হাতের রক্ত লাগে কপালে, গালে, সারা দেহে।

শোণিতাক্ত ভৈরবকে দেখে হঠাৎ নেশা ছুটে যায় ময়নার। হায়রে, হামি কি করলেক—কি করলেক!

তুমি তো কিছু করোনি ময়না—ব'লে তাকে ধ'রে মাটিতে বসাতেই সে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে সাধুর পায়ের তলায়।

ভৈরব আবার বলে, যার হাত কাটল সে কাঁদছে না, অথচ কাঁদছো তুমি! আত্মসম্বরণ করো। ঐ দেখো, এসব দেখে হাসছেন আমার রাধাকৃষ্ণজী।

[কুড়ি]

পরদিন অতি প্রত্যুষেই শ্যামলী ও চন্দ্রাকে নিয়ে ভৈরব রওনা দেয় বংশীতলা। আবার কিসে কি হয়, ওদের দিয়ে আসাই ভালো।

সাধু বংশীতলায় পৌঁছেই ফেরার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। চন্দ্রা বলে, তা কি হয়?

শ্যামলী বলে, যাবেই তো—দু'টো কথা আছে শুনে যাও। তারপর ক্ষতস্থানটা ভালো ক'রে পরখ করে। বড্ড ব্যথা করছে, না? তুমি না থাকলে কাল যে কি হ'ত!

তেমন লাগেনি শ্যামলী। সামান্য একটু আঘাত, ও কাল পরশু সেরে যাবে। হ্যাঁ, তুমি যা বল্‌ছিলে তার জবাব শোনো—আমি না থাকলে হয়তো কিছু ঘটতোই না। শ্যামলী, একটা কথা মনে পড়ে? ছোটবেলার কথা?

না,—বুঝতে পারছিনে কি তুমি বলতে চাও? একটা বালিশ এনে দেবো, শোবে? রাত্রে তো যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারোনি।

দরকার নেই। বরঞ্চ তুমি কাছে বসো, কথাটা শুনে যাও। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। তোমাকে একটা ময়না এনে দিয়েছিলাম—ময়না নয়,

একটা জংলা টিয়া। তুমি তার ঠোক্করের ভয়ে তাকে বুলি শেখাতে পারলে না। কিছুদিন বাদে বিরক্ত হয়ে ফেরত দিয়ে এলে, মনে পড়ে ?

পড়বে না কেন ?

তারপর সে কত বুলি শিখলো, কত মধুর কৃষ্ণনাম শোনালো মানুষকে! মুগ্ধ হয়ে যেতো, যারা আসতো যেত, কিংবা হঠাৎ শুনতো। কিছুই সহজ নয় শ্যামলী!

এতো পাখী নয় ভৈরব, সাপ।

বাঁশীর শব্দে বশীকরণ মন্ত্র আছে। সাপও তো বশ মানে।

ও তোমাদের ভুল ধারণা. ভুল প্রেরণায় পথ চলছো কিনা, তাই কেবল ঠিকে ভুল ক'রে যাচ্ছো। দেখো না, আমাদের দেশের সব বৈরাগী গৃহী, তুমিই শুধু স্বতন্তর।

হ'তে পারে। ভৈরব মৃদু হেসে উঠে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে সে স্নান ক'রে উপাসনা করতে যায়। শ্যামলীর জন্য তখন আর রওনা দিতে পারে না।

সন্ধ্যার দণ্ড কয়েক বাদে জ্যোৎস্নায় ছেয়ে যায় দিগন্ত। ভৈরব বিদায় নেবে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তমালতলার জন্য।

শ্যামলী ভৈরবের পিছু পিছু বেরিয়ে আসে। যার জন্য দেরী করো বললাম তা তো শুনে গেলে না ?

তুমিই তো বললে না। আমাকে মিছামিছি অনুযোগ করছো কেন শ্যামলী ?

বড়ো লজ্জার বিষয়। বড়ো বাধ-বাধ ঠেকলো বলতে। তবে ভৈরব বলেই বলতে পারলো শ্যামলী। সে অন্তঃস্বত্বা—তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ধ্রুবর ঠিকানায়।

তখন তখনই জবাব দিতে পারে না ভৈরব। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্যামলী নিচের দিকে চেয়ে নখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে।

আমি এখন কিছু সঠিক প্রতিশ্রুতি দিতে পারছিনে, তবে কান খাড়া রেখো—ডাক দিলে বেরিয়ে এসো।

ভৈরব হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করে।

পদ্মদীঘির পাড়ে এসেই নয়নের সঙ্গে দেখা। নয়নের মুখখানা শুকনা, চুলগুলো রুক্ষ। আজও তার সারাদিন আগানে-বাগানে ঘুরেই কেটেছে।

কি হয়েছে রে, তোর মুখে যে রস-কষ নেই?

সকালবেলা আজও একপশলা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে ময়নার সঙ্গে। নয়ন ভালো ভেবেই ময়নাকে বলতে এসেছিল, কিন্তু সে বুঝলো উল্টা। তারই বা দোষ কি? মনটা তো তারও ভালো ছিল না।

বুইনদিদি, তুমি আমার একটা কথা শোনবা?

কি কথারে নয়ন?

না তেমন কিছু নয়, তবে—

তবে ঢং করিস ক্যান্‌, বলে ফ্যাল্‌ ঝট্‌সে।

নয়ন হঠাৎ রেগে গেল। যার উপকার করতে এলো সেই টিট্‌কারী দিচ্ছে। ঢং তোমরাই কর রাত-বিরেতে পথে-ঘাটে।

ময়না থ'মেরে গেল। তুই ছিলিক কোনখানে?

বাড়ি।

আরও আশ্চর্য হয় ময়না।

কিছু ডালপালা ছিল পদ্মদীঘির পাড়ে। গোপী নাকি গত পরশু রাত্রে পাহারা দিতে এসেছিল। দিনের মতো জ্যোৎস্না, কে আবার নিয়ে যায়! সে-ই নাকি দেখে গেছে ভৈরবের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে।

ও শয়তানকে হামি দিবেকনি জমীন্‌।

তা না দেও তোমার কথার খেলাপ হইবে, মামার দোষ কি?

তবে কি হামার দোষ? হামি কি খারাপী আছি?

দোষ তোমার না, দোষ তোমার বয়সের। সাধুও সাধু না।

আর তুই বুঝি সাধু ?

হ্যাঁ, নিচ্চয়—সাধুর থিকা হাজারগুণে ভাল।

তবে শুকের সঙ্গে সাংগাত করলিক যে হারামী ?

নয়ন মুখ চুন ক'রে উঠে যায়। এমন একটা কঠোর গাল যে ময়নাদিদি তাকে দিতে পারে, এ তার স্বপ্নেরও অতীত। তার বুকখানা তখন ফেটে পড়তে চাইছিল। সে ময়নার ওপর কতটা ক্রুদ্ধ হলো ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তার একটা নিদারুণ আক্রোশ জন্মালো সাধুর ওপর।

তাই সে ভৈরবের প্রশ্নের উত্তরে তাকে একটা অতি অপ্রিয় সংবাদ শোনায়।

হইবে আবার কি—গ্রামে আর কান পাতা যায় না। পরশু রাত্তিরে নাকি তোমার কোলে চইড়া বাসায় আইছে ময়নাদিদি ? কি যে কর বৈরাগী হইয়া! ময়নার বাসার দিকে আর এক পাও না বাড়িয়ে ভৈরব আবার বংশীতলার দিকে ফেরে।

নয়নের শুষ্কমুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে ওঠে। সে বাড়ি গিয়ে দিব্যি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

ভৈরব পথ চলতে চলতে আজ বড় অধীর হয়। সে আর কখনও যে এমন কাতর হয়েছে তা তার মনে পড়ে না। সে দুর্নামের ভয়ে কাতর হয়নি। দুর্নাম-সুনাম তার কাছে তুল্য-মূল্য। এখন সে কোন্ পথে যাবে ? ময়নাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার চিত্ত সমাহিত করবে, না অবুঝ শ্যামলীকে এই সামাজিক কলংকের গ্লানি থেকে উদ্ধার করবে ? শ্যামলী তো অবুঝই। অবুঝ না হ'লে এমন করে নিজেকে কেউ কি আহুতি দেয় ? কিন্তু সে যদি সত্য সত্যই প্রণয়াসক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে থাকে ? দেহ মন মাধুর্য দিয়ে ভালবেসে থাকে ধ্রুবকে ? সে কথা দেশের কেউ বুঝবে না, বাড়ির কেউ শুনবে না। আর না-ই বা কেউ গ্রাহ্য করলো, শ্রীরাধাই তো ছিলেন কলংকিনী। কিন্তু ওর মধুকোষে যে অমিয় জমেছে। জন্মাবে নিষ্পাপ কুসুম। সে কুসুমের কে-ই বা হবে রক্ষক, কে-ই বা হবে জনক ? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সবাই মিলে

কালি লেপে দেবে মুখে। এদিকে ময়না বিষণ্ণা। তৃষ্ণার্ত বনমৃগী সবে পোষ মেনেছিল—ভৈরবই তার মুখের সুমুখে ধরেছিল জলপাত্রের বদলে অমৃতভৃংগার, কিন্তু সেও যেন ভয় পেল। ভৈরব পূর্ণ করতে পারলো না তার তৃষ্ণা! ময়না কুঠার হেনেছে, তবুও সে বাঘিনী নয়, মনটা তার এক অল্পবয়সী বালিকার। হঠাৎ রাগী, ঠায় বিরাগী, নয়তো কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ত্রি-সংসার।

কাকে সামলাবে ভৈরব ? সে শুনেছিল জমিদার-বাড়ি নাকি প্রত্যক্ষ ছিল বাল-গোপালজী। আজ বড় দুঃখ হয় সেই দেবতা ও মন্দিরের জন্য। সে অতি সন্তর্পণে নিজের ঝুলি থেকে বের করে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। চন্দ্রালোকে ঝলমল করে ওঠে দিব্যকান্তি। ভৈরব বড়ো কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোন পথে চলতে হবে প্রভু ? আমাকে সন্ধান বলে দাও সুপথের। সে থামে, চাঁদের কিরণে যুগলরূপ দেখে সে কাঁদতে থাকে অঝোরে, আর শুধাতে থাকে বলে দাও, বলে দাও প্রভু! অনেকক্ষণ বাদে যেন উত্তর আসে, তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা করো, সেই তো মহাসংশয়ে বন্ধু। ভৈরব শুধায়, বন্ধু হে, পথ দেখিয়ে দাও। সে তার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিখানা বুকে চেপে ধ'রে বারবার জিজ্ঞাসা করে, বন্ধু হে, বলে দাও পথের সন্ধান। যার বিপদ আশু তাকে সাহায্য করো। এবার ভৈরব দ্রুত এগিয়ে চলে বংশীতলার দিকে। আকাশের থালায় যেন উপছে পড়েছে রূপালী জ্যোৎস্নার নৈবেদ্য। ভৈরব চোরের মতো এসে দাঁড়ায় এক ঘনপত্রবহুল আমগাছের তলে। একটা যেন বিদগ্ধ কোকিল ডেকে ওঠে। ভৈরবের হাসি পায়। এই গতপরশু রাত্রে এখানে উৎসব হয়েছে। বহুলোকের সমাগম হয়েছিল। ঐ তো ব্রজদুলাল শ্রীকৃষ্ণের পটের পাদপীঠ। কত আলো ছিল ওখানে! শ্যামলী ও তার সহচরীরা নেচে নেচে আরতি করেছে। বন্দনা গান গেয়েছে ললিতকণ্ঠে। অঞ্জলি ভরে দিয়েছে শ্বেত সুগন্ধি রক্তিমপুষ্পার্ঘ্য। মনে হয়েছে প্রতিটি নারীমূর্তি যেন বৈরাগ্যের প্রতীক। ভৈরব ছিল প্রধান উদ্যোক্তা, এই তো দু'দিন আগে! আর আজ ?

কে, ভৈরব ?

প্রশ্ন কোরো না, চলে এসো।

এর মধ্যেই তুমি মন স্থির করে এসেছো ? আচ্ছা চলো—আমি আর ঘরে যাবো না। একবস্ত্রে বেরিয়ে আসে শ্যামলী।

খানিক এগিয়ে ভৈরব জিজ্ঞাসা করে, কোন্ দিকে যাবো ?

তা কি আমি বলে দেবো ? ভালো পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে!

শ্যামলী, চপলতার সময় এ নয়। ভোর হওয়ার আর বেশি দেরি নেই। রাত থাকতে থাকতে সাগানপুরের বাজারটা ছাড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত।

হেঁটে না গিয়ে একখানা নৌকা কেরায়া করো না? একেবারে স্টীমারঘাটে পৌছে দেবে।

পরামর্শটা ভালোই। কিছু দূর আবার এগোয় দু'জনে। একটা খালপারে এসে ভৈরব একটা বাড়ির ভিতর ঢোকে। শ্যামলী একাই দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে পথের ওপর। চাঁদ আরও খানিকটা ঢলে পড়ে পশ্চিমে। জ্যোৎস্নার লাবণ্য যেন গড়িয়ে যেতে থাকে গ্রাম, প্রান্তর ও খালের জলের ওপর দিয়ে। শ্যামলী মহা আহ্লাদে চেয়ে থাকে। ভাবে আজ তার মধুযামিনী। প্রিয়তম তার কামিনীকে নিয়ে পাড়ি জমাবে নিরুদ্দেশে, তাই তো এ মধুলগ্ন এলো! ঐতো খেয়ার নাও!

নৌকায় উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসে। একটু পরে আর একটু পাশ ঘেঁষে বসে শ্যামলী। সামান্য একটু বিব্রত হয় ভৈরব। বোঝে, ওকে বলে লাভ নেই, ওর স্বভাবই এই। সুখ-দুঃখে আপদে-বিপদে ওর প্রকৃতি বদলাবার নয়।

জল কেটে নৌকা তরতরিয়ে চলে। চাঁদও যেন চলেছে তাদের সঙ্গে।

স্টেশনে উঠে মাঝিকে যখন ভৈরব বিদায় ক'রে দেয় তখন পূর্বে সূর্য, পশ্চিমে চাঁদ—নদীর খোলা বুকে শুভদৃষ্টি হয় দিন ও রাত্রির।

ভৈরব, আমার দিকে তাকাও তো।

কেন ?

কোন ভয় নই—এমনি!

ভৈরব শ্যামলীর দিকে শিশুসুলভ সারল্যে তাকায়।

বড়ো ভালো লাগছে।

এতো গ্লানি যার মাথার ওপর তার যে কি করে ভালো লাগতো পারে এসব তা সাধু বুঝে উঠতে পারে না।

কোন্ জায়গার টিকিট কাটবো? ঠিকানা কি ধুবর? ঐ তো স্টীমার আসছে!

শ্যামলী উত্তরাকাশ দেখিয়ে দেয়।

অমন করলে আমি চলে যাবো! ঠিকানা বলো।

ঠিকানা তো ফেলে এসেছি।

বেশ!

ঘাটে স্টীমার এসে থামে।

ভৈরব সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও সে হচ্ছে সরল ও মহা অনুভূতিশীল মানুষ। যুক্তিতর্কের চেয়েও তার কাছে বড় হচ্ছে হৃদয়। সেই হৃদয়ের সুযোগ পেয়ে শ্যামলী তাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে—ঠিক ক'রে এসেছে যাবে যেদিকে দু'চোখ যায়। অনির্দিষ্ট অফুরন্ত ঠিকানাবিহীন তার পথ।

[একুশ]

প্রহর খানেক বেলা হ'তে না হ'তেই ময়নাও এ কাহিনী শোনে। সে লজ্জায় ক্ষোভে আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে থাকে। সাধুর কি এই কাজ! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! তবে নয়ন যা বলেছে তা মিথ্যে নয়—সাধু ঠিক সাধু নয়! এইবার অনুশোচনা হয় নয়নের জন্য।

শুধু শুধু নয়নকে আক্রমণ করেছে ময়না। মর্মস্থলেই তার আঘাত লেগেছে, নইলে একটিবারও কি সে এদিকে আসত না! সে সাধ ক'রে দিদি বলে ডাকত, ছোট্ট ভাইটির মতো আবদার করত—সে-সব তার ও ঘুচিয়ে দিয়েছে! ও যেমন বুনো, কাজও করেছে তেমনি। ওর ইচ্ছা করে এখনি একবার দৌড়ে যায়, ডেকে নিয়ে আসে নয়নকে, কিন্তু হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে পড়ে একটা অহেতুক লজ্জায়।

ময়না মনে মনে বোঝে, এখন নয়ন আর এমুখো হবে না। কোনো আকর্ষণই তো নেই। কিন্তু তার মামা তো একবার আসতে পারত। সে বুড়োমানুষ। হয়ত অতটা দোষ নাও ধরতে পারে! ময়না মুখে একবার বলেছে জমি দেবে না, কিন্তু সেই মুখের কথাই কি ওরা ধ'রে বসে থাকবে, একবার পরীক্ষাও করবে না তার অন্তরের সত্যটা?

গোপী কয়েকবার আসার জন্য তোড়জোড়ও করেছে। কিন্তু মামী তাকে ঐ জমিদারীর লোভ ছাড়িয়ে তাঁতের পৈঠায় একপ্রকার জোর ক'রেই বসিয়ে দিয়েছে—আর বেমালুম পাঞ্জাবীটা কোথায় যেন গায়েব ক'রে ফেলেছে। ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাটলে তার সঙ্গে পারা নাকি দুঃসাধ্য। তাই গোপী সকল সংসারী কাজে ইস্তফা দিয়ে সেই যে নিষ্কাম হয়ে তাঁতের পৈঠায় উঠেছে, আর নামেনি। যতক্ষণ মামী নাকি অনুতপ্ত না হবে, ততক্ষণ সে আর নামবে না। সে ঐখানে বসেই দেহরক্ষা করবে।

এইসব নানাকারণে নয়নেরও আর ফুরসত নেই। মামা বেদম কাশছে—মামী অনবরত চরকায় তেল দিচ্ছে, তারও একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো! সে আর বসে থাকে কি ক'রে?

জাবেদালী এসে জিজ্ঞাসা করে, মামা, এখন আমি কি করুম?

তামাক খাও—আর মামীরডে জিগাও—আমি দেখ না, সংসার ছাড়ছি? তারপর গোপী একটু গলা খাদে নামিয়ে বিষাদমাখা স্বরে বলে, বড় দুঃখ, বড় দুঃখ ভাই, যেখানে স্ত্রী নায়ক শিশু নায়ক—এ হিতপোদেশের কথা—সে সংসারে খাটতে খাটতে মর, কোনো সুগম নাই।

হয় মামা, তুমি সার কথা কইছ। তোমার কত জ্ঞেয়ান!

আষাঢ় মাস—গাছে আর আম নেই। ময়না হাঁটতে হাঁটতে দীঘির পূব-পারের বাগানটায় যায়। আশ্চর্য! দু'টো পাকা আম পড়ে রয়েছে! কুড়িয়ে আনে ময়না। গাছ-পাকা আম, সুগন্ধ বার হচ্ছে। সে বাসায় এনে রেখে দেয়। দুপুর বেলা সে কয়েকটা পানিফলও সংগ্রহ করে। এ-সব কি জন্য? সে তো নিজে ফল-ফলাদি খেতে খুব একটা ভালবাসে না। যদি পাগলটা হঠাৎ এসে পড়ে।

সারাদিন যায়, কত অবাঞ্ছিত লোক পদ্মদীঘির পাড়ে নানা কাজে আসে, কিন্তু যার জন্য ময়না উৎকণ্ঠিতা তার দেখা নেই!

হয়ত দিনের বেলা সময় পায়নি।...

সন্ধ্যা বেলা ময়না চেরাগ জ্বালিয়ে পাজাল নিয়ে মা-মনসার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। আজ আর তার আর'ত করতে ইচ্ছা করে না। সে কোন প্রকারে কাজ সেরে বাসায় ফেরে। চুপ ক'রে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। কতগুলো বাঁশের সরু শলা চাঁছে, তাই দিয়ে একখানা ডালা বুনবে। কিন্তু শলা তুলতে গিয়েও তার ক'বার হাত কেটে যায়। সূক্ষ্ম কাজ কি চঞ্চল মনে করা সম্ভব!

অনেক রাত হয়, অনেক রক্ত ঝরে, কিন্তু কেউ তো আসে না!

এমনি একদিন, দু'দিন, তিনদিন...

আমদু'টো পচে গেছে, পানিফল নষ্ট হয়েছে—ময়না ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পদ্মদীঘির জলে দূর ক'রে।

অনেকদিন বাদে ময়নার কেন জানি মনে হয়, এমনি যখন সময় কাটে না তখন একবার তমালতলা ঘুরে আসবে। কাল ভোরে উঠেই সে যাবে। বৌ-ঝিদের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব ক'রে হয়ত মনটা ফিরতে পারে। বুনো জীবন, বুনো পরিবেশে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ওর এতকালের পদ্মদীঘি, এতদিনের এই তোলা বাসায় যেন আর কোনও শান্তি নেই। সবই নীরব। সবই যেন মুখভার করে দাঁড়িয়ে আছে। ময়না কোন সাজ-গোজ করে না—শুধু গেরুয়া শাড়িখানা তুলে রেখে অতি সাধারণ একখানা কাপড় পরে। একেবারে খালিহাতে যাবে, তাই ঝাঁপিদু'টো মাথায় তুলে নেয়—ঝুলিটাও নেয় কাঁধে ক'রে।

পদ্মদীঘি, তারপর সপ্ততাল, তারপর কিছুদূরে এগিয়ে তমালতলা। কেমন ফিটফাট পরিষ্কার বাড়িগুলা! বৌ-ঝিরা কেমন খাটছে! তাদের সময় নেই, কিন্তু ময়নার অফুরন্ত অবকাশ! ময়নাও স্ত্রীলোক, ওরাও তাই। কিন্তু কত তফাৎ! এখানে শিশুর কলরব, গরু বাছুরের হাম্বা আর ময়নার পদ্মদীঘি নিস্তব্ধ নিরালা। একদিন বড় শান্তি ছিল, দিনগুলি কেটে যেত আনন্দে—যখন সে পাগলাটার সঙ্গে আবোল-তাবোল বকে দিন কাটিয়ে দিত। তারপর আরও ভাল লেগেছিল ভৈরবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে। সে অপেক্ষার অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত—সাধু আসত কি আসত না—তবু এ ক'দিন তার বড় ভাল লাগত। প্রকৃতির শান্ত শ্রীতে আজ শ্রান্তি এসেছে—অসহ্য হয়েছে নিঃসঙ্গ জীবন।

ঐ গাছ-গাছালির মাঝখানে ঘরখানা কার? উঠানটুকু কার? পাতায় পাতায় জঞ্জাল জমেছে। কেউ ঝাঁট দেয় না, কেউ দুয়ার খুলে একবার চেয়েও দেখে না। বৈরাগীর তুলসি ঝাড় জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে।

ময়না এই বাড়ির বাসিন্দাকে ভাল ক'রেই চেনে। একদিন তাঁর ছোঁয়া পেয়েছে, গন্ধও সে পেয়েছিল সুঠাম দেহের। আজও সে তা ভুলতে পারেনি,

কোনদিন হয়ত তা পারবে না—ময়নার সারা লোমকূপ শিউরে শিউরে ওঠে। ইচ্ছা করে তার উঠানখানা ঝাঁট দিতে, জল ঢেলে দিতে নির্জীব গাছের গোড়ায়। কিন্তু কেন, কেন সে তা করবে? কোন্ অধিকারে? কোন্ দাবীতে?

হঠাৎ ঝলকে ওঠে বুনো মন—ঝলকে উঠে শ্যামলীর মুখ মনে পড়ে। সাধু তো তার কুসুম, কীট ঐ শ্যামলী!

ময়না গাঁয়ের পথে ফেরে। সাপ খেলা দেখবে গো?…দুধরাজ পদ্মরাজ গোখরা সাপের খেলা ··

অনেকেই ময়নাকে ডাকে, অনেক বাড়িতেই বসতে বলে চাচা-চাচি-বহিনেরা। কিন্তু কেন যেন ময়না থামে না। হেঁকে চলে, সাপ খেলা দেখবে গো…পদ্মরাজ দুধরাজ সাপ

একজায়গায় এসে ময়না থামে, যেখানে বিদায়ের বিশেষ কিছু আশা নেই। প্রাপ্তির আশায় সে সাপের ডালা নিয়ে বার হ'লে এখানে আর থামবে কেন? কত বড় বড় বাড়িই তো সে পিছে ফেলে এসেছে! তা ছাড়া এখানে না এসে যেতে পারত হাটে কিম্বা গঞ্জে।

এখানে এসেছে একটি একাগ্র কর্মমগ্ন মনকে তার কাছে টেনে নিয়ে যেতে। গোপীর বাড়ির পাশের উঠানে—যেখান থেকে তুবড়ির শব্দ ছড়িয়ে পড়বে নয়নের কানে। নয়ন কি আসবে না, এখনও রাগ করে থাকবে ময়নার ওপর?

বাঁশী বাজছে—নেচে নেচে ছোবল মারছে সাপ দু'টো। কিন্তু কেমন সুনিপুনভাবে হাত টেনে নিয়ে যাচ্ছে ময়না! ভুল হচ্ছে না একটিবারও। লোকজন ছেলে মেয়ে এসে ঘিরে ধরে বেদেদিদিকে একটি দু'টি ক'রে।…

কিন্তু নয়ন আসে না। তার মামীকেও দেখা যায় না। গোপী একবার উঠেছিল, কিন্তু মামী তার কাছা টেনে ধ'রে জায়গা মতো বসিয়ে দিয়েছে।

ক্রমে হাতের মুঠো টানতে বারবার ভুল হ'তে থাকে ময়নার। বিষ দাঁত ভাঙা—তবু ছোবলের ঘায়ে ময়নার সারা দেহ জর্জরিত হয়ে ওঠে। মগজ যায়

চড়ে। আচ্ছা হামি দেখাবেক তাঁতির পোকে! সব বেইমান—দুনিয়াদারি বেইমান আছেক।

সে মনে মনে বিড়বিড় করে ঝাঁপি বন্ধ করে—হঠাৎ যেন তাল কেটে যায়। গুঞ্জন ক'রে ওঠে অসন্তুষ্ট জনতা। কি হলো বেদেদিদি? থামলে যে?

সারাদিন কি মাগনা সাপ-খেলা দেখাবেক? হামি বেকুপ আছি?

কথাগুলো ময়নার কানেও কেমন যেন বেথাপ্পা ঠেকে। সে উঠে পড়ে।...

বোকার মতো চেয়ে থাকে দর্শকেরা।

পিছন থেকে অনেকেই ময়নাকে ডাকে, কিন্তু ময়না কোনদিকে দৃকপাত না ক'রে হন্‌হনিয়ে হেঁটে চলে। আসার বেলাও থামেনি, যাওয়ার বেলাও থামে না। যে দেখে সে-ই একটু আশ্চর্য হয়। একে ময়না কোনদিন বড় একটা তমালতলার গাঁয়ের ভিতর আসে না—তাতে যদিও বা এলো, তবু একি?

ময়নার চোখের দিকে চেয়ে বেশি কিছু বলতে কেউই সাহস পায় না। বুনো চোখে কেমন যেন একটা বুনো আগুন জ্বলছে।...

[বাইশ]

অনেকদিন পরে বৃষ্টি নেমেছে। মেঘে মেঘে আঁধার ক'রে ফেলেছে চারদিক। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণই নেই। একে একে এই তো তিন-তিনটা দিন কাটল! চারদিকের গাছ-গাছালি জমিদার বাড়িটার জংগল যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। পুকুরের কালো জল আরও যেন কালো হয়ে উঠেছে। শিকারী বকগুলো যেন গুরুগম্ভীর। একপা দুপা করে যখনই শিকারের দিকে এগুচ্ছে তখনই তাদের চোখে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠছে। পদ্মদীঘির নানা পাড় দিয়ে গলগল করে গেরুয়া জল নেমে ঘুলিয়ে দিচ্ছে এক-একটা জায়গা। কৈ-মাছগুলো তো কানসি বেয়ে অমন যে উঁচু পাড় তাও ডিঙয়ে গিয়ে নতুন জলে পড়ে উধাও হচ্ছে। একটি ছেলে একটা তালপাতার মাথাল মাথায় দিয়ে সেই মাছ কুড়াচ্ছে—কমপক্ষে কুড়িখানেক মাছ সে পেয়েছে।

ময়না অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথাল মাথায় নেংটা ছেলেটাকে লক্ষ্য করে। এই শুনে যা তো।

কি কও মাসী—মাছ নেবা কয়ডা?

ময়না তা চায় না। সে একখানা ছোট ডোঙা নৌকা ডুবিয়ে রেখেছিল তার বাসারই আশ-পাশে কিন্তু দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। এখন যেন কোথায় এদিক ওদিক সরে গেছে একটু। সেই নাও খানা খুঁজে দিতে হবে।

ছেলেটি হেসে ফেলে। মাছের পাত্রটা এবং মাথালটা ময়নার হাতে দিয়ে জলে নামে ঝুপ করে। এ আর কঠিন কাজ কি? কিন্তু পুরো মিনিট দেড়েক সে ডুব দিয়ে খালি হাতে জলের ওপর ভেসে ওঠে। পাওয়া যাচ্ছে না। জায়গাটা অন্তত অনুমানেও নির্দেশ ক'রে দিতে না পারলে কি ক'রে খুঁজে বার করা যায়!

এই ইদিকে ঐ দক্ষিণের খুঁটির বরাবর।

আবার এক ডুব। না।

কলমিদলটার তলাটিতে হবেক—ছাখ ফির ডুব দিয়ে। ছেলেটি ডুব দেয়, ময়না অপেক্ষা করে।

ভুস্ ক'রে ছেলেটি ওপরে উঠে বলে, না। ময়না চিন্তিত হয়।

ছেলেটি বলে যে তাকে বিনা-আপত্তিতে আর কয়েকটা উজানে কৈ-মাছ ধরতে দিলে সে আরও কয়েকবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারে। কেন পাওয়া যাবে না নৌকা?

ময়নার গম্ভীর মুখখানায় একটু হাসি ফুটে ওঠে।

ছেলেটি হাসতে হাসতে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে ওপরে ওঠে। তারপর দু'জনে মিলে একখানা ছোট্ট নাও টেনে তোলে। এমন ছোট এবং এমন হাল্কা যে ইচ্ছা করলে যেমন তেমন শক্ত মেয়েমানুষেও কূল দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। একটি যাত্রী এবং গোটাদুয়েক ঝাঁপি ছাড়া বড় একটা কিছু বোঝা ধরে না। দায় ঠেকে যদি কখনও দু'জনের ওঠার প্রয়োজন হয় তবে প্রখর ভারসাম্য জ্ঞান থাকা চাই -নইলে বিপদ।

বৃষ্টির মধ্যেই ময়না নৌকাখানা পদ্মদীঘির বাইরে বার করে। বেশ জল হয়েছে মাঠে। প্রায় এক মুঠুম। সে আবার বাসার দিকে ফেরে এবং তার যা যা দরকার তাই বার ক'রে নিয়ে বাসা বন্ধ করে। মনটা তার ভাল না। সে একদিকে যাবে। এত বড় গ্রামটায় আজ এমন একটি লোকও নেই, যে তাকে বারণ করবে এই জল-বৃষ্টি মাথায় ক'রে রওনা দিতে। তার সঙ্গে যাওয়ার সাথাও নেই কেউ!

অনেকদিন বাদে ময়নার বুনো স্বামীর কথা মনে পড়ে। যদি সে বেঁচে থাকত, তবে সে যতই ঝগড়া করুক না কেন—এমনি মেঘ বৃষ্টি মাথায় ক'রে কোথায়ও যেতে দিত না। অন্তত বুনো ভাষায় বলত, ঠ্যাং বাড়ালে—ঠ্যাং ভেঙে দিবেক হামি।

দুঃখ কিসের ময়নার—দুঃখ কি! সে তো সারাজীবনটাই একা একা

কাটাবে। শুধু ক'দিনের জন্য একটু রুনু-ঝুনু ক'রে উঠেছিল তার চারদিক। একটু জ্যোৎস্না, এক টুকরা আলো—আবার সব মেঘে ঘিরে ধরেছে। থেমে গেছে রুনু-ঝুনু বোল!...

ময়না নাও খোলে—ঠেলে ঠেলে চলে ছোট বৈঠাখানা।

তার স্বামী আজ কথা বলতে পারছে না। মেঘের কোলে যেন মুখখানা কালি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোবা পশুর মত।

তবু পদ্মদীঘি ছেড়ে চলে ময়না।...

অনেক কষ্টে তার পথ চিনে যেতে হবে। যাবে দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি। তারা স্বামী-স্ত্রীতে নাকি সংসার ফেঁদেছে। সাপের খেলা ছেড়ে পেশা ধরেছে বৈদ্যালী। একবার অনেক দিন আগে ময়না সেখানে গিয়েছিল। তার স্বামী তখনও মরেনি। কি আনন্দে তারা তখন দু'জনে বাঁকের পর বাঁক ছোট হিলবিলে খাল দিয়ে নাও বেয়ে গিয়েছিল। কখনও গলুইতে সে, মাঝি তার স্বামী—আবার কখনও গলুইতে তার স্বামী, মাঝি ময়না। এক একবার ইচ্ছা ক'রেই একটু তেরছা ক'রে হাল ধরেছে—নৌকাখানা হুস ক'রে গিয়ে পাড়ে ঠেলে উঠেছে ঝাড় জংগলে।

তার স্বামী বিরক্ত হয়ে বলছে। নাইয়া মাঝির মাইয়া—এত বেহুঁশ!

আবার হুশিয়ার হয়ে হাল ধরেছে—নৌকা চলেছে ঠিক পথে। ঘন ঘন ছোট ছোট বাঁক ওস্তাদ নেয়ের মত কাটিয়ে উঠেছে অবাধে।

জানিস সব—শুধু মাঝে মাঝে চতুরালি।

ময়না হেসে উঠেছে! লয়রে সাংগাত লয়—হামি বোকা আছিক। হামাকে শিখিয়ে বুঝিয়ে লিতে হবেক। বলতে বলতে নৌকা আবার ঠেলে উঠেছে হারগুজি বনের কাঁটার ভিতর।

সে একদিন গেছে! রাতটা ছিল শুক্লপক্ষের। আর আজ একদিন এসেছে—ঘন বর্ষার।

মাঠ ছাড়িয়ে ময়না খালে এসে পড়ে। ছোট খাল হলেও স্রোত প্রখর।

উজান বেয়ে যেতে হবে খানিকটা। মাঠ আর খাল একাকার হয়ে গেছে। স্রোত আছে বলে খাল আর মাঠে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। আর বোঝা যাচ্ছে পারের গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড়ের জন্য।

হাল্কা নাও, তাই ময়না উজান ঠেলে যেতে পারছে। অবিরাম টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে—যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আকাশটা। ময়নার মাথায় মাথাল আছে একটা। আর যা কিছু তা একখানা কলাপাতা দিয়ে ঢাকা। মাথায় মাথাল থাকলে কি হবে, ময়নার কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে।

এমন বাদলায় কোথায় যাও, কে গো তুমি?

একজন বুড়ো পিছন থেকে অমনি একখানা ডোঙা বেয়ে এগিয়ে আসে। ও বাইগ্যার ঝি। বাড়ি কই?

তমালতলা।

তোমার মুখ দেইখাই বুঝ্‌ছি যে তুমি বাইগ্যার ঝি। কি রুগী—সাপ-কাটি?

না।

তয় কি? যাবা কই?

কদমপুর, বহিন-বাড়ি।

আমিও যামু সেইদিকে। কেডা তোমার বুইন? এত গরজ যে?

বহিনের সাংগাত তোমার পাড়ার বৈন্তি আছেক।

বোঝলাম। তোমারও রুগী আছে—নইলে এমন ডাওরে যাও।

একটা বাঁক এসে পড়েছে। লোকটা একটু পিছনে হটে আবার এগিয়ে আসে। রুগী নিচ্চয় আছে। কও না ক্যান্—আমি বুড়ামানুষ, বাঁধন-ছাদনের মন্তর জানি না। ডর কি? কও না বুইন?

ভারী মুস্কিল তো। রুগী আছেক চাচা, তার বয়েস অল্প। জোয়ান মেয়েমানুষ।

আহা! সাপ-কাটি? কোথায় ঘা দেছে?

বুকে—বুকে!

কি সাপ ?

জানিকনি।

রুগী দেখে নাই সাপটা ?

ক্যামন্ করে জানবেক হামি।

জানো তুমি, নিচ্চয় জানো--কও না ? বড় আপশোষের কথা—সোমত্ত বয়েস··· !

না চাচা, এই হামার লাখান।

তোমার তো কাঁচা বয়েস। ছাওয়াল-পাওয়াল নাই ?

না—কেহ নাই দুনিয়ায়।

কার কথা কও ! তোমার না রুগীর ?

বুঢ়া চাচা কিচ্ছু সমঝাবেক না !

বুড়োমানুষ—এত হেঁয়ালী বোঝা সত্যই দুঃসাধ্য। তবু একটা কিছু অনুমানে স্থির ক'রে নেয়। নিযে বলে, বুঝুম না ক্যান্—এখন বুঝ্ছি সব। কিন্তু কি সাপে ঘা দিছে তা তো কইলা না ?

সাধু সাপ।

সাধু আবার সাপ হয় কি কইরা ? সাপের তো এমন নাম কখনও শুনি নাই। তুমি তো কম না বুইন,—এতক্ষণ ধইরা ঠাট্টা করছ আমার সাথে !

ময়না একটু হেসে বলে, না চাচা, না—খোদার কসম সত্যই সাধু সাপ।

বুড়ো রেগে ওঠে। আর তোমার সাথে কথা কমু না—এতক্ষণে বোঝলাম তুমি নাইয়া বাইস্থার ঝি-ই বটে—মস্ত ফেরব্বাজ মিথ্যাবাদী।

খালটা এখানে এসে একটু চওড়া হয়েছে। বৃষ্টিও যেন কিছুটা থেমেছে। বুড়ো একেবারে চুপ-চাপ। শুধু দু'খানা বৈঠার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক-জোড়া দল-ছাড়া হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক ক'রে ওঠে খালের জলে। আর বেশি দূর নয় কদমপুর, বুড়ো বলে। এখন আর তারা কেউ উজান বাইছে

না। গোন মত নাও চলেছে বেশ জোরে। খালের দু'পাড়ে দু-একটা প্রদীপের আলো এসে পড়েছে : আশ-পাশে সব গৃহস্থবাড়ি।

আমি এইখানে নাও ভিড়ামু—তুমি আর একটু আগে যাইয়া জিগাইয়া লইও পথ।

আদাব চাচা—গোঁসা করবিকনি।

না, না—তুমি বুইন আসল বাইত্যার ঝি। রোগ না সারলে কিছু করা না—এতক্ষণে আমি বুঝ্ছি, ওস্তাদের নিষেধ।

ময়না এ কথার আর কোন জবাব দেয় না। হয়ত সে মনে মনে ভাবে : নিজের রোগ কোনো বৈদ্যই নিজে সারাতে পারে না—বিশেষত যেখানে বিষের ক্রিয়া।

আবার কিছুদূর এগুতেই আর এক দল লোকের সঙ্গে দেখা। তারা চলেছে একখানা ছোট কাঠামিতে কচু-কলা বোঝাই ক'রে। ওল এবং তেঁতুলও কিছু আছে। রহস্যপরায়ণ জাতির মেয়ে এই ময়না, এত কষ্টের ভিতরও খিলখিল ক'রে হেসে ফেলে। লোকগুলো সচকিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আঁধারে খাড়া-ঝিলিক (বিদ্যুৎ) ঝিলমিলিয়ে ওঠে যেন।

হালের হাতল ঘুরাতে ঘুরাতে একজন প্রশ্ন করে, কে যায়? বাইত্যা-মাগীগো মত হাসে ক্যান্?

বাইত্যা-মাগীর লাখান নয় জোয়ান, এক বাইত্যার ঝি হামি।

যাবা কই?

কদমপুর।

বড় হাস্ছ যে?

বাথা ওল রইছে নায়ে,—বুনা তেঁতুল কই?

ভাল কইরা দেখ না, আছে সবই।

বড় নৌকার কাছে এসে ভেড়ে ময়নার নাও। সত্যি তোদের রস-কস জেয়ান আছেক। হিঃ-হিঃ-হিঃ—যেমন ওল, তেমন তেঁতুল!

হাসির বিষ হীরার ধারের মতো গিয়ে কেটে বসে মেয়েদের মনের কাঁচে।

কে একজন যেন বলে, ছোট ডোঙা বাইন্ধা আসো না বড় নায়ে। আমরা যামু চর-সমুদ্দুরের হাটে।

তা হলে হামি আর যাবেকনি কদমপুর। শাওন মাসে মেলা বসে ঝুলনের, হামি যাবেক মেলায়। বহুত গোঁসাই আসে, নারে ?

হুঁ।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ?

তাও আসে অনেক।

হালের মাচা থেকে আবার প্রশ্ন হয়। এত সাধুর খোঁজ যে মাসী ? মালা-বদল করবা নাকি ?

ময়না গম্ভীরভাবে বলে যে তার তা অনেককাল আগে হয়ে গেছে।

ওরা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। ওদের বিস্ময় কাটে ময়নার গেরুয়া বস্ত্র দেখে। তয় তুমি বাইন্যা না—হইছ বৈষ্ণবী! গান গাইতে পার মাসী ?

তা আর পারে না ময়না! সে স্মিতমুখে মাথা নোয়ায়।

নৌকা এসে পড়েছে বড় গাঙে। দুরন্ত বন্যার ভাটা। হাল না ঘুরালেও নৌকা চলে তীরের মতো। পরনের ছেঁড়া কাপড়-চোপড় সামলে এসে ওরা ময়নাকে ঘিরে বসে। ময়না একটু গুনগুন করতে করতে গান ধরে, যে-গানখানা শ্যামলী সেদিন গেয়েছিল ভৈরবের সুমুখে বসে। মূর্ছনায় ওপারের গাছপালা ঠেলে, আঁধার কেটে, উঠতে থাকে যেন আলোর মালা আকাশে। ভৈরব নেই, সমঝদার এই কলা-কচুর মূর্খ দোকানীরা। ওরা যা-ই বুঝুক —খানিক ঝিম মেরে থেকে ব'লে ওঠে, ভাল, ভাল!

শুধু হালের মাচার মাঝি কিছু মন্তব্য করে না। তার চোখে জল আসে। তারও ভালবাসার জনকে কে যেন ভুলিয়ে নিয়ে গেছে গত আষাঢ়ের প্লাবনা। এমনি সেদিন মেঘ ছিল, এমনি নাকি ঝরেছে বাদল!

ময়না ভাবে, হয়ত সাধু আসতে পারে, মেলায় গেলে দেখাও হ'তে

পারে হঠাৎ। সে এদের কাছে যা ব'লে ফেলেছে, তাই করবে—যাবে মেলায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একবার যদি চোখাচোখিই হয়ে যায় তখন সে কিছু বলার আগেই শ্যামলী পথ পাবে না পালাবার। সে একঠাঁই ক'রে ফেলবে মেলার যত লোক।

শ্যামলী ধূর্ত। যখন সাধুকে নিয়ে বেরিয়েছে তখন সাধারণের নাগালের বাইরে গিয়েই থামবে। সে কিছুতেই আসবে না চর-সমুদ্দুরের মেলায়। চর-সমুদ্দুর আর কতদূর, তার চেয়েও অনেকদূর সে চলে যাবে! চলে যাবে কালাপানির পারে, নয়ত জংলা কোন্ পাহাড়ে। আর হয়ত ফিরবে না, কোন চিহ্নই হয়ত সাধুর পাওয়া যাবে না। সাধু ছিল, কি ছিল না তা হয়ত ক্রমে ক্রমে ভুলে যাবে তমালতলার বাসিন্দারা।

ভুলবে ময়নাও, কিন্তু এখনই তা পারছে কই?

নগদ-ছগদ মোছে না যে মায়া!

হয়ত শ্যামলীর কোন দোষ নেই, সাধুই তার খারাপ। খারাপ মানুষটাকে পাবে কি করে? পেলে পরে, সে ওঝার ঝিয়ারী, বৈদ্যের বৌ, দেখত একবার গুণ-জ্ঞান ক'রে। কত ওষুধই তো সে জানে, না পেলে খাওয়াবে কাকে শিলে-খলে বেঁটে!

চন্দন-কুংকুমের টিপ দিয়েও সে সারাতে পারে এসব রোগ। কিন্তু কোথায় তার ভৈরব?

ভাবতে ভাবতে ময়না ভৈরবময় দেখে সারা রাত্রির জগৎ। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে শুনতে পায় শুধু সাধুর সংগীত।

ওপারের বন-গ্রাম-গঞ্জ, এপারের নদী-জল-প্রান্তর, পলিমাটির নতুন চর যেন গুঞ্জন করছে সেই রাগিনী। তবে কি তার সাধু খারাপ?

লয়, লয়, লয়—

নেয়ে-মাঝিরা জিজ্ঞাসা করে, ও কি মাসী?

ময়না হাসে।

ওরা বলাবলি করে, মাগী পাগল!

তাই তাড়াতাড়ি ওকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। তুমি কদমপুর যাবা না মাসী?

হুঁ।

তয় এই গাঁয়ের খাল ধইরা যাও উত্তরে।

ময়না অনেকদূর এগিয়ে এসেছিল। তার কদমপুর ঘুরে যেতে পরদিন সন্ধ্যা উৎরে যায়।

[তেইশ]

ময়নাকে দেখে তার ভগ্নী তো মহা সন্তুষ্ট। ভগ্নীপতি ছুটে আসে হামানদিস্তা ফেলে। দু'টি ছোট ছেলেমেয়েও এসে একটু তফাতে দাঁড়ায়। ময়না তাদের কোলে নিতে যায়। কিন্তু লজ্জায় তারা মার কাছে পালায় ছুটে। ওদের জন্য ময়না বিশেষ কিছু দামী জিনিস আনতে পারেনি—এনেছে এক ঘট মধু। অনেকদিন পূর্বের সঞ্চিত, পদ্মদীঘির মধু। দু'জনার হাতে ঢেলে দেয়। ওরা মহা আনন্দে চাটতে থাকে।

ছোটছেলেটিই দেখতে সুন্দর হয়েছে। ময়না তার বোনের কোল থেকে একবার ছিনিয়ে আনে অতিকষ্টে। আয়রে বাদুরের ছানা—আয় হামার কোলে।

ছেলেটা কেঁদে ফেলে। ময়না বারকয়েক বুকে চেপে ধ'রে কচি অধরে চুমো খেয়ে ফিরিয়ে দেয় ওর মার কাছে।

এরা নৌকা ছেড়ে রীতিমত গৃহস্থ হয়েছে। ঘরদোর তুলে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ সুখেই আছে। ময়না ঘুরে ঘুরে ওদের ঘর দু'খানা দেখে। কোথায় ঢাল-সড়কি, কোথায়ই বা ল্যাজা! তার বদলে এখানে ওখানে নানা

লতাপাতা-শিকড়-গাছের ছাল। কোনটা শুকনা, কোনটা কাঁচা, কোনটা সন্ত সন্ত তুলে এনে রাখা হয়েছে ডালা, কুলো অথবা মেটে বাসনে। হরীতকী, বয়রা, আমলকী শুকিয়ে রেখেছে ডালা ভরে। আমলকীর নাকি প্রয়োজনও অধিক, সংগ্রহও প্রচুর। একটা ছোট কাঠের বাক্স খুলে দেখায় তার ভগ্নাপতি। ওই নাকি ওদের পুঁজিপাট্টা। ছোট ছোট গোল গোল শিশি-ভর্তি সব ওষুধের বড়ি। একটা তীব্র গন্ধ আসে ময়নার নাকে। ময়নার এসব ভালই লাগে দেখতে। ছোট একটি সুখী পরিবার।

কিছুকাল আগেও যে এই বাহাদুর ওঝা চুরি ক'রে জেল খেটেছে, তা আজ আর কে বলতে পারবে! বাহাদুর জেলে বসে এক কবিরাজ কয়েদীর সঙ্গে আলাপ ক'রে এসব শিখেছে—তারপর খাটিয়েছে মাথা। তাতেও সে সুবিধা করতে পারত না, যদি না এই মহুয়া তাকে উঠতে বসতে সাহায্য করত। আসল বৈদ্যই মহুয়া—বাহাদুর তো তার তাঁবেদার। তার প্রমাণ ময়না ভোর হলেই পাবে। গাঁয়ের জোয়ান ছোকরারা বাহাদুর বাড়ি থেকে বার হলেই এখানে এসে দাওয়াই চায় বৈদ্যি বহিনের কাছে—মিঠা দাওয়াই। বড় তিতা নাকি ওঝার ওষুধ!

বলতে বলতে বাহাদুর মৃদু মৃদু হাসে।

মহুয়া একটা ঝামটা মেরে তাকে থামায়।

খানাপিনা হ'তে রাত প্রায় দুপুর হয়। এদের ব্যবস্থা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বেদে-মাঝির নায়ের মতো নোংরামি নেই। পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্ট। ময়না অবাক হয়ে যায় এসব দেখে। তার ধারণা ছিল সে-ই বুঝি একটু স্বতন্ত্র—কিন্তু তা তো নয়! অনেকেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে সুযোগ-সুবিধা পেলে। চোরও হয় সাধু।

আবার পরিবেশের আবর্তনে সাধুও হয় চোর। তার প্রমাণ ভৈরব। দিনের পর দিন সে ময়নাকে কি উপদেশ দিয়েছে—কিন্তু নিজে রেখে গেল কি নজির!

ময়নাকে প্রতারিত করেছে? না, তা করতে পারেনি। প্রতারিত হয়েছে সে নিজে। শ্যামলীই তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ময়নাকে নিয়েও পালিয়ে যেতে পারত ভৈরব!

গেলে মন্দ হতো কি!

সে একতারা বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইত, ভিক্ষা করত, জীবন কাটিয়ে দিত ভজন-পূজনে।

ভৈরব যা বলেছে তার একটি কথাও তো মিথ্যা নয়। সে হয়ত মিথ্যা বলতেই জানত না। কি অপূর্ব কান্তি, কি অপূর্ব সারল্য! বলেছিল, সকলি অসার, শুধু সার তাঁর নাম। ময়নার কত আছে—জমি-জায়গা, অতবড় একটা পদ্মদীঘি—যার মাছ বেচে বছর বছর হাজার টাকা ক'রে পাওয়া যায়, আম-জাম-নারকেলের আর হিসাব ধরে কে? কিন্তু এ সকলি অসার। তাই তো সে পালিয়ে এসেছে এখানে। শান্তি নেই—শুধু শ্রান্তি।

ভাবতে ভাবতে থেই-হারানো নানা চিন্তায় অভিভূত হয়ে পড়ে ময়না।

এমন বাদলায় এলি যে বহিন?

তোদের দেখবেক বলে।

হয়ত সত্য হ'তে পারে, কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া বলে মনে হয় মহুয়ার। এমন দিনেও মানুষ আসে!

কিছুদিন থাকবি তো?

মন বসলেক আর হামি যাবেক না তমালতলা।

এতক্ষণে আসল কথা ধরা পড়ে। মনের তাগিদে এসেছে ময়না, মায়ার তাগিদে নয়। তবু তো এসেছে! থাকুক দুদিন। ময়নার মতো অতিথি পাওয়া ওদের সৌভাগ্যের বিষয়। ওরা ময়নার কাছে এমন একটা কি! কালো হলেও ও শ্রীমতী। হাজার হলেও ওর কত ভূ-সম্পত্তি সোনা-রূপো আছে। থাকে যদি, থাকুক না দু'দিন।

ভোর না হতেই ময়না নিজে গিয়ে খোপের হাঁস-পায়রা মুরগী-রাওয়া মুক্ত ক'রে দেয়—উঠানে ছড়িয়ে দেয় খুদকুঁড়ো। গরুটাকে গোয়াল থেকে বাইরে আনে, গোবর ফেলে, দড়িদড়া গুছিয়ে রাখে চালের বাতায়। বড়-মেয়েটাকে নিয়ে ঢেঁকিঘরে যায়, ধান ভানবে। আজ আর আকাশে মেঘ নেই—পূবদিক বেশ ঝকঝক করছে।

ও কি? না-না! মহুয়া এসে বাধা দেয়।

ময়না মহুয়ার কথা শোনে না। অনেকদিন বাদে সংসারী কাজ করতে তার বড় ভাল লাগছে। সুন্দর গোছানো সংসারটি। তার মনের মতো সব কিছু।

সারাদিন ধ'রে সে ধান ভানে, ভিজা কাঠ-কুটি বাইরে বার ক'রে শুকাতে দেয়—ভগ্নীপতির ওষুধপত্রগুলো গুছিয়ে রাখে। কোনরকমে চারটি মুখে-দেওয়া ছাড়া এতটুকু বিশ্রাম করে না।

মনে মনে তার ভগ্নী সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু তার কাছেও এসব নিতান্ত অদ্ভুত ঠেকে। যদি মহুয়া ময়নার বাড়ি গিয়ে এসব করত, তা যতটা খাপছাড়া না দেখাত তার চেয়ে অনেক বেশি খাপছাড়া দেখাচ্ছে এখন। কারণ ময়না ইচ্ছা করলে পাঁচ পাঁচবার কিনতে পারে ওদের।

ওরা বেদে-জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য ছেড়েছে, কেবল একটা জিনিস ছাড়তে পারেনি—মা-মনসার আরতি। এখানেও উঠানের একটি কোণে একখানা মণ্ডপ আছে। দামী প্রতিমা নেই। কুমোরবাড়ি থেকে একটা বড় ঘট কিনে এনেছে, যাতে মা-মনসার ছবি আঁকা।

সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলে গান গায়, আরতি করে।

ময়না ছেলেমেয়েদের নিয়ে মণ্ডপের সুমুখে গিয়ে দেখে সব। তারপর আজ একখানা জিয়ন-গান ধরে—প্রাণভরে জিয়িয়ে তুলবে লখীন্দরকে, তার অন্তরের মৃত সুন্দরকে। আর কতকাল সে ভেলায় ক'রে অকূলে ভাসবে? একবার চোখ মেলে চাও—ওগো বেনের ছেলে, একবার বাহু মেলে বুকে

জড়িয়ে ধর তোমার অভাগিনী বেহুলাকে। বেহুলা তোমার কাঁদছে। ওগো সুন্দর জাগো—জাগো—জাগো—

ময়না কাঁদে না। সে চুপ ক'রে বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকে। রাত্রে আর খেতেও ওঠে না। এমনি করেই দিনগুলো কেটে যেতে থাকে তার।

[চব্বিশ]

আর কত দূর শ্যামলী ?

যতদূর গিয়ে সন্ধান পাওয়া যায়—ধ্রুব তারা কি এতই নিকটে ?

এখনো হেঁয়ালী রাখো—বলো ধ্রুব কোথায়, কি তার ঠিকানা ? আর কত তোমার সঙ্গে ঘুরবো ?

এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলে ? হায়রে সাধু!—শ্যামলী চটুল কটাক্ষে তাকায়। —সারা জীবন নিজের জন্য ঘুরে হাঁপালে না,—আর অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে এই ক'টা দিন আমার জন্য ঘুরে ? যাই বলো, সাধুরা বড্ড আত্ম-সুখী।

তুমি বড় বাচাল।

একটা স্টেশনে এসে ভৈরব ও শ্যামলী জাহাজ থেকে নেমেছে। সকালবেলার রাঙা আলো পড়েছে শ্যামলীর মুখে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে! ওপরে আকাশ, নিচে নদী, মাঝখানে শ্যামলী—সবই সুন্দর। তবু যাত্রীরা শুধু শ্যামলীর দিকেই চেয়ে থাকে।

ভৈরব জিজ্ঞাসা করে, এখন কোথায় যাবে ?

কয়েকটা দিন আগে সে এমনি এক সকাল বেলা কিছুতেই জাহাজে উঠতে চায়নি। ঠিকানা স্থির নেই, কোথাকার টিকিট কাটবে ? শ্যামলী তাকে জোর ক'রেই জাহাজে ঠেলে তুলেছে।

চলো তুমি, ভয় নেই—ঠিকানা না জেনে কি আমি এসেছি ?

তবে যে বললে ফেলে এসেছো ?

বলেছিলাম তোমাকে চমকে দিতে।

এখন তো আর টিকিট কাটার সময় নেই। ইচ্ছা করেই স্টীমার ফেল্ করলে।

আমি থাকতে তোমার কাছে টিকিট চাইবে না। উঠে পড়ো শীগ্‌গির। এসো আমার হাত ধ'রে—পিছন পিছন এসো।

আমি কি অন্ধ ?

নিশ্চয় ! নইলে দুধ ছেড়ে ঘোল খাও।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে এলো, চেকার চ্যালেঞ্জ করে, টিকিট ?

শ্যামলী বলে, তাড়াহুড়ায় কাটা হয়নি, মাশুল দেবো, পথ দিন। আমারা তীর্থে যাবো

চেকার পথ ছেড়ে দেয়। যাও আমি আসছি।

এক্ষুণি আসুন না !—শ্যামলী মুখ মচ্‌কে চোখ কুঁচ্‌কে জবাব দেয়, ভয় নেই, পালাবো না, আমরা তীর্থ-যাত্রী।

যাও, আসছি। দেড়া মাশুল লাগবে।

ওরা গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠে। জাহাজের একটি কোণে আশ্রয় নেয়। বেশ হাওয়া আসছে ঝিরঝিরে। ঝুলিটা নামিয়ে রেখে, ভৈরব একটা কম্বল বার করে।—ব'স শ্যামলী।

আবার ধোবে কে ?—শ্যামলী নিজের আঁচল বিছিয়ে বসে পড়ে। ধীরে ধীরে বলে, তুমি এখন অস্পৃশ্য।

এ কথার অর্থ কি ? ও অন্তঃস্বত্ত্বা, সেই কথাই কি স্মরণ করিয়ে দিতে চায় ? ভৈরবের ব্যবহারে কি কোনো ত্রুটি হয়েছে ? সে সংকুচিত হয়ে বসে। ঈশ্বরকে স্মরণ করে বারবার।

প্রায় মাইল খানেক স্টীমারটা এগিয়ে আসে। যাত্রীরা ওঠা-নামা কলরব

করে। কত গাছপালা বন জংগল পেরিয়ে যায়! কত স্নিগ্ধ শ্যামল শস্য ক্ষেত্র! কত গাংগ্‌চিল শালিখের ঝাঁক!

ভৈরব জিজ্ঞাসা করে, এখন কোন্ তীর্থে যেতে চাচ্ছো?

এ অবস্থায় যেখানে যায়।

বুঝলাম না।

অন্ধকে হলদে সবুজ বোঝানো দায়।

ভৈরব আর কথা না বাড়িয়ে চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। আচ্ছা লোকের পাল্লায় তাকে ফেলেছেন ভগবান। এও এক পরীক্ষা। ভৈরব স্মিত মুখে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

টিকিট চেক্ করতে করতে চেকারটি এইদিকে আসতে থাকে।

এখন কি বলবে সাধু, আগে ভাগেই ঠিক ক'রে রেখো। সঙ্গের স্ত্রীলোকের যেন অপমান হয় না।

ভৈরব উঠে যায়। সন্ন্যাসীরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

মাশুল কে দেবে? দেড়া লাগবে কিন্তু।

শ্যামলী একটু মাথার আঁচল টেনে বলে, আমি দেবো মাশুল, বসুন ঐ কম্বলটায়। কিন্তু উসুল করতে হবে গান শুনে। আমরা জাত বৈরাগী—তীর্থ-ধর্ম করি দশের কৃপায়।

স্টীমারের যাত্রীরা দু'একজন ক'রে এগিয়ে আসে।—

চেকার বলে, কোম্পানীর এ আইন নয়—ভাল চাও তো টাকা দাও। যাবে কোথায় শুনি?

নবদ্বীপ।—শ্যামলী একটু ভেবে বলে, তা হ'লে আমাদের এখানে কোথায়ও নামিয়ে দিন—যে কোনো স্টেশনে।

যাত্রীরা বলে, এখন তো কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটরের চেয়েও আপনার ক্ষমতা বেশি। এদের মাশুলটা ছেড়ে দিন না! বরং দু'খানার

জায়গায় পাঁচখানা গান শুনুন। আমরাও শুনে আপনাকে আশীর্বাদ করি। এক ঘেঁয়ে জার্মনি আর ভাল লাগে না।

এত যদি গান শোনার ইচ্ছা, এদের মাশুলটা আপনারা দিয়ে দিন না।

একজন বৃদ্ধ বলে, ভাল প্রস্তাব। আমি এক টাকা দিচ্ছি। তীর্থ-যাত্রীকে সাহায্য করায় পূণ্য আছে। সে ছাড়া গান তো শোনা যাবে ফাউ। কে কি দেবেন, দিয়ে দিন এক্ষুণি। দেরি হ'লে নেওয়া হবে না।

দু'আনা, এক আনা, আট আনা ক'রে মাশুলের চাইতে বেশি টাকা ওঠে। একটু আশ্চর্য হয় চেকারটি। সে মাশুলের পাওনা গুণে নিয়ে বাকিটা ফেরত দেয়। ফেরত যা কিছু তা আবার বৃদ্ধ তুলে দেন শ্যামলীর হাতে।—তোমরা কৃষ্ণ প্রেমিক, সেবায় লাগিও।

শ্যামলী বলে, আপনাদের জয় হোক।—সে শক্ত ক'রে আঁচলে গিঁট দেয়। তারপর গান ধরে মিষ্টি গলায়।

বৃদ্ধ বলেন, ভাই চেকার, তুমি এবার কানে তুলো দাও। তোমার কিন্তু ন্যায্য অধিকার নেই গান শোনার।

প্রথম গানটি শেষ হ'লে চেকার নিজের কাজে চলে যায়। শ্যামলীর আশে-পাশে আরো ভিড় জমে ওঠে। বিষয় বাসনা তেজারতির লেনদেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যায় এই ভাব-মুগ্ধ জনতা। মনে হয় এতদিন পর্যন্ত জীবনে যে পাঁক জমেছিল, তাতে ফুল ফোটাল ঐ বৈরাগী মেয়েটি। অপরূপ পদ্ম ফুল!

একজন খালাসী এসে বলে, এই টাকাটি পাঠিয়ে দিল চেকারবাবু।—সে সসম্ভ্রমে শ্যামলীর হাতে টাকাটি দেয়, শ্যামলী একটু হাসে। ফিরে গিয়েই খালাসী আর মন বসিয়ে কেন জানি কাজ করতে পারে না। বারবার সে উদাস হয়ে যায়। সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত থেমে থেমে গান চলে। ভৈরব এসে যখন যোগ দেয় তখন একেবারে অনবদ্য হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমান যাত্রীরা ভাবে, ঈশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহ ব'লেই আজ তারা এ জাহাজে উঠেছে। যার গন্তব্য শেষ হয়ে আসে, সে একটা ব্যথা নিয়ে নামে।

জাহাজ এগিয়ে চলে বাঁক ঘুরে ঘুরে। রাত শেষ হয়ে যায়। সকালবেলা নোঙর ফেলে সারেঙ।

শ্যামলী জাহাজ থেকে উন্মুক্ত ঘাটে নেমে যাত্রীদের মঙ্গল কামনা ক'রে বিদায় চায়। ভৈরব থাকে হাত জোড় করে, যেন বিনয়ের পূর্ণ মূর্তি।

যে বৃদ্ধ ওদের রাহা খরচের চাঁদা তুলে দেওয়ায় অগ্রণী হয়েছিলেন, তিনি বলেন, জন্ম জন্মান্তর তোমাদের সঙ্গে যেন এমনি পথে প্রবাসে সাক্ষাৎ হয়—প্রণাম।

ভৈরব জিজ্ঞাসা করে, এখন কোথায় যাবে শ্যামলী!

নবদ্বীপ।

ওরা এসে সেদিনই নবদ্বীপ পৌঁছায়। কয়েকটা দিন কাটায় এখানে ওখানে, গাছ তলায়, ভিক্ষা ক'রে।

তোমার ধ্রুব কোথায়? তার তো খোঁজ করলে না?

সে তো আমার সঙ্গে রয়েছে, আবার খুঁজবো কি?

মানে?

একটু ভয় হয় ভৈরবের? তার ঘাড়েই না সমস্ত কলংক চাপায় শ্যামলী। সে যে-সে মেয়ে নয়!

তোমার ভয় নেই ঠাকুর। আমি যে ডালে চড়ি, সে ডালে কুড়ুল মারি নে।

শ্যামলীর মুখের দিকে ভৈরব অবাক হয়ে তাকায। ওর কাছে কি চায় শ্যামলী? ঈশ্বরেরই বা কি অভিপ্রায়? ভৈরব স্থিতধী হয়ে চিন্তা করে। তারপর মনে মনে বলে, তুমি যা করাও তাই আমি করি। আমার পৃথক কোনো সত্তা নেই।

কিছুদিন বাদে শ্যামলী বলে, ধ্রুব এখানে নয়—বোধহয় শ্রীক্ষেত্রে।

ভৈরব জবাব দেয়, সেদিন যে বললে তোমার সঙ্গে রয়েছে?

ভুল বলেছি। সে তো অন্ধ।
তবে শ্রীক্ষেত্রেই চলো।
ওরা আবার তল্পি-তল্পা গুটায়।

[পঁচিশ]

কিন্তু যত গোলমাল হয় গোপীর সংসারে। যে পরিমাণে তার তাঁত বন্ধ গেছে সে পরিমাণে আয় হয়নি গাছের ডাল-পালা বেচে। কেবল লোকসান, কেবল লোকসান! ময়না মাগী দেশ ছেড়ে গেল, কিন্তু একটিবার জানিয়েও গেল না গোপীকে। সে যে গিয়ে তার খোঁজ নেবে তারও অন্তরায় তার ঘরের শনি দু'টো। সে কিছু দিন রাগ হয়েছিল—ভেবেছিল, এমনি একটা উদাসীনতা দেখালে মামী এবং ভাগ্নে ভয় পাবে, কিন্তু ভয় পাওয়া তো দূরের কথা—একটু ভাবও বদলাল না তাদের। আষাঢ় মাস তো যায় যায়—আর চাষ আবাদ হবে কবে! এখনও যদি নয়ন একটু গরজ করত, নিশ্চয় বেদে মাগীর খোঁজ পেত। সে সব দিকে তো খেয়াল নেই এতটুকুও, শুধু ঘরে বসে বসে মামীর সঙ্গে ঘুস্থুর-ঘুস্থুর। ময়না নাকি গাল দিয়েছে। তাতে হয়েছে কি? যার অত বড় একটা পদ্মদীঘি—সে গাল কেন, মার দিলেও গোপী ফিরত না। একটু মেনে-শুনে চললে দহরম-মহরম রাখলে যে কি হয় তা বুঝবে কি বেহিসাবীরা!

একটু তোয়াজ ও তোষামোদ ক'রে মানুষের কাছে থেকে যা পাওয়া যায় তার তো সবটাই লাভ। নগদ একটা পয়সাও তো লাগল না। গোপী ওই ক'রে বাকি টাকাটায় তাঁত কিনেছে, বাকি পয়সায় সুতো এনেছে। নইলে আজ ঘরে বসে অমন মামী ভাগ্নেয় ঠাহরা-ঠাহরি জুটত না। অন্ন-চিন্তা থাকলে চুলোয় যেত যত সব মস্করা। থাক্, যা ইচ্ছা করুক—গোপী আর ক'দিন!

লবণ আনা লাগবে।

লবণ ? আলুনী খা। আমি আগেই কই নাই।

কি কইছ ?

একটু ময়না মাগীর খোঁজে যা—এর পর তো ভাতই জোটবে না। এখনি হা-লবণ, হা-লবণ করতে আরম্ভ করছ, এরপর করবি হা-ভাত, হা-ভাত। ক্যান্, লবণ যে আইনা দিলাম আড়াই স্থার ?

কবে ?

এই তো কয়দিন হইল !

কয়দিন হইল ! বেশ, রাইন্ধা দিমু আলুনী।

যা কপালে আছে তাই তো খাওয়াবি ! নইলে এমন দুর্বুদ্ধি হয়। অমন একটা সহায় পাইয়া কিছুই বুঝলি না।

তুমি যতই কও না ক্যান্, নয়ন আর ওদিকে পাও দেবে না। বাপ-মা তুইলা গাইল ! মামী নিজের কাজে চলে যায়।

মামা ভাগ্নে মুখোমুখি ব'সে বেতালে মাকু টানতে থাকে। ফলে দু'জনারই কখনও সুতা কাটে, কখনও খেই হারায়।

কতক্ষণ বাদে নয়ন তাঁত ছেড়ে ওঠে। হাটে যাবে—একখানা ডোঙা কেরায়া ক'রে আনতে হবে। নিজে নৌকা নিয়ে হাটে না গেলে পরের সঙ্গে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু আসার সময় বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়। এক-একদিন তারা নয়নকে ফেলে আসে। আর আজ যেতে হবে একটু দূরের হাটে—দু-দু'টো নদী পাড়ি দিয়ে।

তুমি মামা, একখানা আর ডোঙা গড়াইতে পারলা না।

বাঁন্ধে-ছান্দে কেডা—তুই যে নাগর ! হয় খাল থিকা চোরে নেবে, নয় তো একদিকে ভাইসা যাইবে। তার থিকা হাটবার হাটবার এক আনা নগদ গেল। বর্ষাকালডা গেলে তো তুই হাইটাই যাইতে পার।

পারুম না ক্যান্—পাইছ যে মাগ্‌না গোলাম।

শোন্, শোন্ তোর নয়নের ভাগ্য, একটু রান্ধন থুইয়া শুইনা যা। আমি কাইলই যামু কাশী।

ওপার না গিয়া এপার থাইক্কো—একটু খরচ কম লাগব।

কি, আমারে কইলি ব্যাস কাশী থাকতে? আমি গাধা আর সেয়ান বুঝি তোরা দুইজন?

নয়ন এসব কথায় আর কান না দিয়ে নৌকা কেরায়া ক'রে আনতে যায় এবং কিছুক্ষণ বাদে তা নিয়ে ফেরে।

আইজ হাটে না গেলেও হইত। কাপড় কয়খান তো লক্ষ্মণ নিতে চাইছিল সাড়ে চাইর আনা কমে।

পয়সা চাইর গণ্ডা বুঝি গায় লাগল না? নবাব পুত্তুর!

আকাশের অবস্থা ভাল না, পয়সা দিয়া করুম কি! দেও মামী ভাত দেও।

তুই ছান করলি না? ঘাড়ে দেখি খাসের মত ময়লা জমছে।

পথেই দেখো না ঘোর ডাওর (বর্ষা) লামে নাকি। সারাদিনই তো নাইতে হইবে।

নয়ন নৌকা খোলবার সময় মামী তাড়াতাড়ি এক সের চাল এনে দেয়। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে একটু ভাল দেইখা কয়েক পাতা দোক্তা আনিস—আবার বাজে খরচ করিস না।

না মামী, সে ভয় তুমি কইরো না। তোমার লক্ষ্মীর ঘটের চাউল!

তোরে কি আমি সাধে ভালবাসি! তুই না থাকলে মইরাই যাইতাম। ওডা যে চামার!

তুমিই বা কম কি? একদিনও তো একটা পয়সা দেও না বিড়ি খাইতে।

না দিলেও তোর কাছে থিকা তো হিসাব কইরাও লইতে পারি না ষোল আনা। হিসাব চাইলে তুই কেবল তোর মামার চাইর পাশে ঘোরো—আর মাথা চুলকাও।

নয়ন ডোঙা ঠেলে চলে যায়। যতক্ষণ সে না বাঁক ঘোরে মামী ঘরে ফেরে

না। সে জীবন ভ'রে একটা গন্ধতেল মাথায় দিয়ে দেখেনি। একটু আলতা পরেনি পায়—তার জন্য এখন আর দুঃখ করে না—কিন্তু দোক্তাটুকু না হ'লে তার চলে না। ঐ একটি মাত্র বিলাসিতা। নয়ন না থাকলে কে জোটাত?

নয়নের অনুমান মিথ্যা নয়। বর্ষার ভিজা বাতাসে খালপারের লতাপাতা উড়িয়ে এনে খালের জলে ফেলতে আরম্ভ করে। পাতলা পাতলা মেঘে ঢেকে ধরে সূর্যটাকে। ছৈ নেই, সাধারণ হাটুরে ডোঙা। নয়ন এক জায়গায় একটু নৌকাটা থামিয়ে দাঁত দিয়ে কয়েকটা আস্ত কলাপাতা কেটে নিয়ে কাপড়ের গাঁটটা ঢেকে রাখে। কলার পাতা হাল্কা জিনিষ, হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে, তাই চাপা দেয় একখানা বৈঠা দিয়ে। আষাঢ়ের রোদের চেয়ে বর্ষা একরকম মন্দ নয়। কেমন ছায়া পড়েছে চারদিকে—ঘন কালো ছায়া। এলোমেলো রাশি রাশি নানারঙের গাছের পাতা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে। কতরকম সাদা সাদা ফুল ফুটেছে থোকায় থোকায়। নয়ন সজোরে লগি মেরে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ছলছল করে খানিকটা এক নিশ্বাসেই যেন ছুটে যায় ডোঙাটা—তারপর আবার গতি হয়ে আসে মন্থর। নয়ন বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে একখানা গান গাইতে থাকে।

নয়ন তাঁতির ছেলে হ'লেও সুগায়ক। কণ্ঠে তার গ্রাম্য গান সুর লয় ও তানে অনবদ্য হয়ে ওঠে। খালপারের ফুটন্ত কদমাগছগুলো যেন বিস্মিত হয়ে থাকে।

দু'পাড়ে গাছ, মাঝখানে সরু খাল—সেই খাল বেয়ে চলেছে নায়ক। যেন প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম তোরণের তল দিয়ে এগিয়ে চলছে সওদা নিয়ে গরীব এক সওদাগর। শুধু সাতখানা সাতরঙা শাড়ি। কোন্ বিদেশিনী সাতজন তার প্রতীক্ষায় গাঙপারে বসে আছে? তাদের কি সে চিনবে?—এমনি একটা গানই গাইছিল নয়ন।

খালের একটা বাঁক এসেছে, মোড় ঘুরবে নাও।

সামাল, সামাল। কে যায়—আপনা বাঁয়ে।

একখানা অমনি ছোট ডোঙা এসে পড়ে খড় বোঝাই। টক্কর খেতে খেতে বেঁচে যায়।

তোর ময়নাদিদিরে দেইখ্যা আইলাম—খড় কিনতে গেছিলাম, দেখা হইল খাল পারে।

হঠাৎ নয়নের গান থেমে যায়। কি কইল ময়নাদিদি?

তোরে যাইতে কইছে।

কেন যাবে নয়ন? যে যাওয়ার সময় একটু খবর দিয়ে পর্যন্ত যেতে পারল না তার সঙ্গে আবার দেখা! চোখ রাঙাল, বিনা দোষে গাল দিল—সে সব কথা নয়ন ভুলে যেত যদি একটিবার ময়না তাকে ডেকে নিত।

গাঙে এসে পড়ে নয়ন। ছলবলে স্রোতে ছোট নাও পাড়ি দিতে সাহস হয় না। কিন্তু যে মামা—কোনও কৈফিয়তই সে শুনবে না। হাট বন্ধ হ'লে একটা তুমুল হট্টগোল অনিবার্য। তার সঙ্গে মামীও হয়ত আজ ফোড়ন কাটবে কারণ তারও তো দোক্তা নেওয়া হবে না। নয়ন পাড়ে নাও ভিড়িয়ে ভাবতে থাকে। ওদিকে থৈ থৈ করতে থাকে জল।

এক একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন নেচে নেচে উঠছে গাঙ। পাড়েও তো নৌকা রাখা যায় না জলের তড়পানিতে। কূল বেয়ে ছল্‌কে উঠছে, দেখতে দেখতে আবার ভেঙে পড়ছে। তেমন বাতাস নেই, তাতেই এই। যদি মাঝগাঙে গিয়ে দমকা হাওয়া একটু জোর চলে? বড় নৌকাগুলো নির্ভাবনায় পাড়ি জমাচ্ছে—ছোটগুলো নয়নের মতো পাড়ে বসে দেখছে। না, আর পাড়েও রাখা দায়। নয়ন একটা ছোটখালের ভিতর গাছের তলে এমন জায়গায় এসে আশ্রয় নেয় যেখান থেকে ওপারের হাটটা পরিষ্কার দেখায়।... বাতাস চলছে বেশ একটু জোরে। এমন হাওয়া কতক্ষণ থাকে কে জানে!

অনেকক্ষণ বসে বসে নয়নের একটু শীত বোধ হচ্ছে। সে মাথার গামছাটা

খুলে গায় জড়িয়ে নেয়। একবার তার ঝিম আসে, আবার সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে। বেলা যায়!

ওপারে হাট তো নয় নৌকার মেলা—শুধু নাও, ছোটবড় অজস্র। কত দেশ থেকে কত পণ্য নিয়ে যে এসেছে! বেগুন, মরিচ, মনোহারী, ধান-চাল, নানা রকম হাঁড়ি-পাতিল, কাপড়-চোপড়, কাঁসার বাসন। মাছমাংসও বাদ যায়নি। আঁক, আলু, আদা এনেছে কত ব্যাপারী। মঘ এসেছে, মাড়ওয়ারী এসেছে—এসেছে নানা জাতির মানুষ। শাদা কালো মোটা খাটো। ঐ হাটেই সকলের প্রয়োজন—নয়নেরও ছিল, কিন্তু সে তো যেতে পারল না। এপারে বসে রইল ভয়ে।

ওই তো একখানা আম-বোঝাই নাও যাচ্ছে পাড়ি দিয়ে। একটু বড় বটে, বোঝাও তো ভারী। তার পাশ কাটিয়ে ঢেউ ঠেলে চলেছে আর একখানা ছোট্ট নাও। আশ্চর্য ডোঙাখানা! নিশ্চয় ওর গরজ বেশি, নইলে কি ও সাহস পায় এমন পাগলা নদীতে নাও ধরতে! ও হয়ত চাল কিনবে। হয়ত হাতে নগদ পয়সা নেই—কেউ ওয়াদা করেছে হাটে বসে পয়সা দেবে, তা উসুল করবে, তারপর চাল। নয়ত ওর কিছু বেচতে হবে। কচু, কলা, মুরগী, হাঁস—অথবা নারকেল কিম্বা তাল। যা-ই হোক, ওর এমন প্রয়োজন যে প্রাণ হাতে করে বৈঠা ধরেছে। এই যা! ঐ তো ডুবল। সব গরজ বালাই শেষ হলো। না, না, ওই আবার উঠেছে—ঢেউয়ের মাথায় যেন মোচার খোলা। ওস্তাদ নেয়ে! প্রত্যেক ঝাপটায় কুয়াশার মতো জল ছড়িয়ে যাচ্ছে তবুও ফিরছে না। কত লোক অবাক্ হয়ে আছে, কত লোক হতাশ হয়ে দেখছে। কেউ বলছে বোকা, কেউ বলছে সাহসী। ওর কোনদিকে লক্ষ্য নেই—শুধু লক্ষ্য ওপারে, ঐ হাট, ঐ লেনদেনের গঞ্জ।

সংসারের তাগিদে ও দুঃসাহসী হয়েছে—হয়ত স্ত্রী-পুত্রের রুজির তাগিদে। কিন্তু নয়নের এমন কোনও গরজই তো নেই। মামা তাকে ভালবাসে মাকু ঠেলবার জন্য, মামী তার গুপ্ত সওদা করবার জন্য! ব্যস, ইস্তকবিস্তি কাবার!

কিন্তু একজন ভালবাসত বিনা প্রয়োজনে—সে তার ময়নাদিদি। ভাগ্য দোষে সেও ফেলে গেছে মাটির ঢেলার মতো !

এখন আর তার এ জীবনটার মূল্য কি !

নয়ন নায়ের দড়ি খোলে—পাড়ি ধরে ওপারের দিকে। এপারের ছোট ছোট ডোঙা-নেয়েরা নিষেধ করে, কিন্তু নয়নের কানে সে কথা যায় না। মূল্যহীন একটা জীবন থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি !

কিন্তু ওপার যাওয়া পর্যন্ত এমন যে তুচ্ছ জীবনটা ঠিকই থেকে যায়। হাটে উঠে কাপড় বেচতে হয়—দোক্তা কিনতে হয় দেখে-শুনে, মুনও আনতে হয় সের-আড়াই।

আবার পাড়ি দিতে হবে। তখনও নদীটা ক্ষিপ্ত। ঘোলা জল ঘুলিয়ে উঠছে তুফানের ঘায়।

এবার আর নয়নের জীবনটা মূল্যহীন মনে হয় না। কারণ অমৃতের ঠোংগা তো সঙ্গেই রয়েছে পুরোপুরি আড়াই সের ওজনের। মামীর মতে ও তো মুন না—একেবারে অমৃত, আর রয়েছে এক মোচা দামী দোক্তা।

এসব যে বয়ে নিয়ে যাবে, তার জীবনটা আর মূল্যহীন হয় কি ক'রে !

কিন্তু কেমন ঘূর্ণি দেখা যাচ্ছে মাঝ গাঙে ! বাতাস ক্ষেপেছে, বৃষ্টি এসেছে—কূলের নৌকাগুলো মাথা কুটছে ঢেউয়ের দাপটে। মাঝ গাঙে ও-তো ঘূর্ণি নয়—ভুল দেখছে নয়ন। ঘুলিয়ে উঠছে ঘোলা জল।

আজ আর পাড়ি দেওয়া যাবে না। ডোঙা নৌকাখানা টেনে আনে নয়ন। হড়হড় করে নাওখানা অনায়াসে পিছলে আসে এঁটেল মাটির ওপর দিয়ে। একখানা হাটুরে বাচারির খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে সে এসে একজন দোকানীর পাশে বসে। এবার আঝোরে বৃষ্টি নামে। হাটে ক'খানা বা বাচারি, ক'খানা বা ঘর ! হাজার হাজার লোক তার ভিতর এসে মাথা গুজতে চায় ! তা তো সম্ভব নয়। অনেকে পাশে দাঁড়িয়ে ছাগলের মতো ভেজে। এর মধ্যেই হাটের পথঘাট কাদায় একাকার হয়ে গেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে

সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এত জল কেউ নাকি জীবনে দেখেনি। অবশ্য পূর্ব বাঙালায় হামেসাই এ বৃষ্টি লেগে আছে, তবু যেদিন তা একটু জাঁকিয়ে আসে সেদিনই লোকে এ কথা বলে।

নয়নের জীবনটার নাকি তেমন কোন মূল্যই নেই—মূল্য বেড়েছিল যে দু'টো অমূল্য সামগ্রীর দরুণ তা এই গণ্ডগোলে কে যেন হাতড়ে নিয়েছে।

একটা হৈ চৈ পড়ে যায়…দেখ দেখ…খোঁজ খোঁজ…

হাটের সমস্ত জনতা ভেঙে পড়ে এদিকে। লোকের ঠাঁশা-ঠাঁশিতে কত বুড়োর যে দাড়ি ছেঁড়ে, কত বাবুর যে কাপড় ফাড়াফাড়া হয়! কত লোক যে পিছলে চিৎপাত হয় কাদায়! গালাগালি হাতাহাতি তাও হয় জায়গায় জায়গায়।

সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নয়ন।

তাকে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয় কাজীর কাছে। হাটের মালিক মব্বেত মোল্লা, কিন্তু কাজী ইসমাইল খাঁ। বেঁটে, ঘুঘুর মতো চোখ জোড়া।

নয়নের প্রতি অভিযোগ সে একটা মিথ্যা হট্টগোলের সৃষ্টি করেছে; তার নুনের ঠোংগা ও দোক্তার মোচা যে চুরি গেছে তার প্রমাণ কি?

নয়ন ভ্যাবাচ্যাবা খেয়ে যায়। সত্যিই তো এমন কোনও প্রমাণ সে দেখাতে পারবে না। দোক্তা তো বিশেষ কিছু সনাক্তের সামগ্রী নয়।

ইতিমধ্যে আর একটা হৈ চৈ শোনা যায় একটু দূরে।

চোর ধরা পড়েছে, চাক্ষুস প্রমাণের জোরে। তাকে মারতে মারতে আনা হচ্ছে এদিকে। হাত দিয়ে কেউ মারছে না—পচা পানিকচুর মোটা মোটা ডগা দিয়ে ধমাধম পিটছে। লোকটার চোখে জল, মুখে দিব্যি একটা অনুশোচনার ভাব ফুটে উঠেছে!

নয়ন দোক্তার মোচা এবং নুনের ঠোংগা সমেত সসম্মানে বিদায় হয়।

কে যেন মন্তব্য করে, এ যাত্রা খুব বাঁচলা মণি—এমন আর কইরো না। —অর্থাৎ কোন দিন হাটে এসে আর সওদা হারিও না।

অনেক রাত্রে নয়ন বাড়ি ফিরে ধপাস ক'রে নুনের ঠোংগাটা এবং ঠাস করে দোক্তার মোচাটা মামার সুমুখে ফেলে দেয়। এই নেও তোমার কপাল।

মামী সুরুৎ ক'রে দোক্তার মোচাটা কোলের ভিতর সরিয়ে ফেলে।

কি নিলি, কি নিলি মাগী? মামা একটা কেরোসিনের ডিবা নিয়ে এগিয়ে আসে।

মামী কৌশলের সঙ্গে দোক্তার মোচা সমেত মেয়েটাকে কোলে নিয়ে দুধ দিতে থাকে। এতও সন্দেহ বাতিক!

গোপী তবু নিঃসন্দেহ হ'তে পারে না। সে এদিকে ওদিকে কুকুরের মতো শু কতে থাকে। দোক্তার গন্ধ পাই যে।

নয়নতারা নয়ন নাচিয়ে সদ্য-দোক্তা দেওয়া দাঁত দু'পাটি একটু বিকশিত করে।

ওঃ! বোঝলাম।

এরপর একদিন হাট থেকে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে নয়ন বাড়ি এসে ওঠে। গাঙে ভরাডুবি হয়েছে। গোপীর মূলধন শাড়ি সাতখানা ভেসে গেছে—নয়ন বেঁচেছে কোন রকমে। ঝড় না তুফান না—হঠাৎ একটা স্টীমার এসে পড়েছিল। নয়ন হাজার চেষ্টায়ও টাল সামলাতে পারল না। সে আগে উল্টে পড়ল নদীতে, পরমুহূর্তেই ডোঙাখানা ঢুকে গেল স্টীমারের চাকার নিচে। তারপর আর বলার প্রয়োজন হয় না।···

নয়নের নাকি কোন দোষ নেই। স্টীমারখানা বাঁক ঘুরছিল একেবারে নদীর কূল ঘেঁষে। নয়ন তো প্রায় পাড় ধরেই বেয়ে যাচ্ছিল। জাহাজখানা চলে গেলে ও পাড়ি ধরত। কিন্তু সেই জাহাজই এসে পড়ল ওর ঘাড়ে!

গোপী কাশতে কাশতে শয্যাশায়ী হয়! ক'দিনের মধ্যেই জ্বর আসতে থাকে বিকালবেলা। টিপটিপে বিদঘুটে জ্বর।

গোপীর কলিজার বাঁধন শিথিল ক'রে দিয়ে গেছে ময়না—বাকিটুকু

ঢিলে করে নয়ন। একটি নয় দু'টি নয়, প্রায় পনর বিশটা টাকার মূল্যবান শাড়ি। তাঁতে তো এখন আর কাপড় নেই, আছে কয়েক জোড়া গামছা। তা দিয়ে কি ক'রে সংসার চলবে ?

গোপীর সমস্ত জীবনের সঞ্চিত মূলধন, রক্তবমি-করা অর্থ! শাড়ির সুতোয় রঙে ঢালা ছিল। আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর, কি তারও কিছু বেশি হবে ঐ মূলধন চক্রাকারে ঘুরছে। একবার রঙে সুতোয় জড়িয়ে যাচ্ছে আবার চকচকে রূপোর টাকা হয়ে হাতে আসছে। প্রত্যেকটি বিবর্তনে প্রসব করে যাচ্ছে সিকি দুআনি আধুলি, তাতেই সংসার চলছে।……

মামা কবিরাজ ডাকি।

না, না—তোর কোনও জ্ঞেয়ান নাই।

মামার অবস্থা দেখে নয়ন আর বাদানুবাদ করে না। মামীর কাছে গিয়ে বসে।

আরও কিছুদিন যায়। গোপী এখন আরও পাকা পাকা কথা বলে। হিসাব কইরা দেখলাম কবিরাজেরে দুইডা টাকা দেওয়া বেথা। মূখ্খ বৈদ্যি যমস্বরূপ। আমি চ্যাবন-প্রেয়াস বানামু। একখানা বহু পুরাতন তালিকা বার করে গোপী। তার হিসাবের বস্তানীতে ছিল। এই সব আয়োজন কইরা খাইতে পারলে কান্তি হইবে মহেশ্বরের মত। চির যৌবনাকান্তি। জানো বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধরছিল ক্যান্ ?

না মামা।

মহাদেবের রূপ দেইখা। সেই রূপ পাইল কোথায় তা জানো—দিব্য ষোড়শী যুবতীর রূপ ?

না।

হায়রে অজ্ঞেয়ান! এই চ্যাবন-প্রেয়াস খাইয়া। আগে বানাইয়া লই, একটু চাইখা দেখিস। তারপর নয়নকে তালিকা দেখায় এবং হরীতকী আমলকী খয়রা ঘৃত মধু রজত প্রভৃতি জোগাড় করতে বলে। এসব সংগ্রহ

হ'লে সে বাকী জিনিসের ফর্দ দেবে। এবং তা কিভাবে কখন কোনদিকে মুখ ক'রে চয়ন করতে হবে তা বুঝিয়ে দেবে।

গোপী নিজের জন্ত ওষুধ তৈরী করবে, তাই নিদানের তালিকা ছাড়াও মূল্যবান রত্ন মুক্তা মিশিয়ে দেবে। ওসব জিনিস সকলের সহ্য হয় না ব'লেই নাকি সাধারণত কবিরাজেরা ব্যবহার করে না—কিন্তু গোপীর পাকস্থলী তত দুর্বল নয়। সে রমেশ বণিকের দোকান থেকে মুক্তা কস্তুরী কাঞ্চন অভ্র যা যা ভাল মনে করবে আনা আষ্টেকের কিনে আনবে। সিকিভাগে ওষুধ জ্বাল দেবে। আট আনাই যথেষ্ট!

নয়ন আবার ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে।

[ছাব্বিশ]

ময়না সহজ দুঃখে পদ্মদীঘি ছেড়ে আসেনি। এসেছে অনেক জ্বালায় অনেক ব্যথায়।

সে বিধবা হয়ে একা একা অল্পদিন ঐ পদ্মদীঘির বাসায় কাটায়নি। কিন্তু এমন অসহ্য হয়নি কখনও। সারাদিন সে একা কাটাত বটে, কিন্তু কান তার পাতা থাকত তমালতলার দিকে। গ্রমের হাসি অশ্রু আনন্দ বিসর্জন—এমন কি জন্ম-মৃত্যুর ঢেউ পর্যন্ত তার বাসায় ভেসে আসত। কখনও উলুধ্বনি কখনও ঢাকের বাজনা কখনও উচ্ছ্বসিত শোক, কোনটাই বাদ যেত না। ময়না কান পেতে শুনত, আর গ্রামের একটি প্রতিবেশিনীর মতো আনন্দে এবং উৎসবে যেমন অধীর হয়ে উঠত—তেমনই ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ত বিয়োগান্ত দুঃসংবাদে।

এমনি ক'রে বুনো ময়না আত্মীয় হয়ে উঠেছিল তমালতলার। সেখানে নাকি

সে আর ফিরে যাবে না। হতভাগা নয়নটাকে পেলে পদ্মদীঘিটা বন্দোবস্ত দিয়ে দিত। খাজনা বাবদ বছর বছর যা পেত তাতেই তার দিন কেটে যেত। তার একার ক'টাকাই বা লাগে বছরে!

সে এখানে বেশ আছে। মিশে গেছে ভিন্ন এক সংসারের রক্ত-মাংসে। দিনরাত সে ইচ্ছে করেই খাটে, তাতে হয়েছে কি? মহুয়া একটু ঢিলে দিয়েছে, দিলই বা—দেবেই তো, ময়না তো আর পর নয়। যদি পরও হয়, সে তো আপন হয়েই রইতে এসেছে!

ছেলেটা এর মধ্যেই মাছি মাছি বলতে শিখেছে। থপ থপ করে চলার কী বাহার! চুমো খেতে বললে গালের উপর মধুর লালা লাগিয়ে দিয়ে পালায়।······

মেয়েটাও হয়েছে ময়নার বাধ্য। সে রোজই পাশের হক সাহেবের বাড়ি কোরান পড়তে যায়। রোজা-নামাজ শিখে পরদানসিন মেয়েলোক হবে—নইলে গাঁয়ের কোন সমাজে নাকি তার সম্বন্ধ হবে না। এসব নতুন হলেও বেশ ভালই লাগে ময়নার। মহুয়া তো ধীরে ধীরে মিশতে চাইছে গ্রামের আর পাঁচজনের সঙ্গে, কিন্তু অন্তরায় হয়েছে ঐ মনসা—আধি-ব্যাধির দেবতা—সমস্ত জরিবুটি নাগ-নাগিনী এলেম ফুঁকের মালিক। তাকে ওরা জান থাকতে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। এর জন্য যদি এ গাঁয়ের কেউ মহুয়ার মেয়েকে সাদি না করে—ওদের সমাজেই বিয়ে দেবে। মেয়ে কোথায় কোন নদীতে নায়ে নায়ে থাকবে, এই যা—তার জন্য সে এখন করবে কি! পিতা পিতামহের আমলের সংস্কার সে ছাড়তে পারবে না।

বহিন সাংগাত করবিকনি? ছাওয়াল-পাওয়াল না হলেক গুণা হবেক—মরলেক মাটি পাবিনি।

হামি তো এক সাধুকে বিয়া করেছিক। তারপর একটু রক্তাভ হয়ে ময়না বলে, ভারী শ্রীমান সাধু!

হামরা তো জানলেকনি !

সাধু ভারী লাজুক বহিন—মানা করে দিলেক সোর করতে।

এখন কোথা আছেক লচ্ছিন্দর ? বড় মিঠা নাম তো !—সাধু। সাধু, কি ছেক ?

সাধু পালোয়ান—তাগ্‌ড়া জোয়ান মরদ আছেক লো।

বাহারী সাংগাত হয়েছেক। হিংসা হয় মহুয়ার। তোর সোনা চাঁদি করলিক কি ? হাঁসুলী, বুকের আসরফি ?

মুখখানা কালি ক'রে ময়না বলে, সাধু চোর ছিলেক—হামার সব কিছু লিয়ে ভেগেছেক, বড় আপসোস বহিন, বড় আপসোস্! ময়নার চোখ জোড়া হঠাৎ ব্যথায় মেদুর হয়ে ওঠে।

এত্তা বেইমান ! টাংগি ছিলেকনি, কাটারী ছিলেকনি বাসায় ?

চোর তো মালুম দিলেক না—হামি কি করবেক বল্‌ ? বড়া বেইমান। ওঃ !

তোর সব লিয়েছেক ?

হুঁ।

ময়না কল্পিত ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে থাকে। কিন্তু সেই ব্যথার ভিতর থেকেও যেন একটা পরম শান্তির আস্বাদ পায়।

মহুয়া তাড়াতাড়ি উঠে যায় এবং গিয়ে তার স্বামীর কাছে সব কথা সবিস্তারে বলে। হয়ত কিছুটা ফেনিয়েও বলতে ছাড়ে না।

বাহাদুর হামানদিস্তায় কি যেন কুটছিল। তা কুটতে কুটতে সব গুঁড়ো হয়ে উড়ে যায়।

কিছুদিন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একরকম কথা বন্ধ হয়ে থাকে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আর কারুর মুখ দিয়ে হুঁ-হ্যাঁটি পর্যন্ত বার হয় না। এ হলো কি ? তারা কত জল্পনা-কল্পনা, কত পরামর্শ করেছিল ! ময়না যখন এসেছে তখন ওকে বিয়ে দিয়ে এখানেই রাখবে। ও কেন একা একা পড়ে থাকবে ছাড়া দীঘিটায়। ওদের বাড়ির ওপরই তো একটা ভিটি খালি পড়ে রয়েছে।

ময়নার নাম শুনলে কত সম্বন্ধ এসে ওর পায় গড়াগড়ি যেত। ও কালো হলেও কেমন লক্ষ্মীমতী!

এখন গয়না ছাড়া ময়নাকে কে পুঁছবে! ওতো বেকার—অলক্ষ্মী।

আরও একটা কথা ভেবেছিল বাহাদুর—

ওর জানা-শুনো আত্মীয়ের মধ্যে একটা আধ-পাগলা ওঝা আছে। তাকে নাকি ঠিকও করে রেখেছিল। ময়না রাজী হলেই কাজটা হয়ে যেত। এখন যা শোনা গেল তাতে এ বিয়েতে বাহাদুরের স্বার্থ কি?

সে চেয়েছিল বিয়ে হয়ে গেলে একদিন দুপুর-রাতে পাগলাটাকে খুন ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দেবে পেট চিরে। পেট চিরে না দিলে মরাটা ফুলে ভেসে উঠতে পারে। আবার হ্যাংগামা হ'তে পারে থানা-পুলিসের। তারপর গয়নাগুলো হাত ক'রে বলত যে ওঝা নিয়ে পালিয়েছে। অবশ্য গয়না হাত করাও কঠিন ছিল, কিন্তু তা একরকম ক'রে পারা যেত যখন মহুয়া রয়েছে। মহুয়ার বুদ্ধি তো কম নয়! বাহাদুরের বুদ্ধি যখন ডালে পালায় ঘোরে মহুয়ার বুদ্ধি তখন পাতায় পাতায় নাচে। সংসারটা তো বেঁধে-ছেঁদে মহুয়াই রেখেছে।······

ছেলেটা মাছি মাছি করে অস্থির হলেও মহুয়া আর সহজে ময়নার কোলে দেয় না। ময়না আর ক'দিনের জন্তই বা এসেছে। যদি অত বাধ্য হয় তবে পরিণামে মহুয়াকেই পস্তাতে হবে। তখন জ্বালা হবে ভয়ানক।

ময়না ধান ভানতে গিয়েও বাধা পায়। এ বাধা আর প্রথমবারের বাধায় আকাশ পাতাল ব্যবধান। তখন ছিল কিছুটা মায়া কিছুটা সমীহ, এখন সম্পূর্ণ বিরক্তি। পাড় দিতে ভাল না জানলে নাকি ধানে থাকে চাল, সে ধান হাজারবার চালুনীতে দিয়েও নাকি বাছা যায় না। যাদের যা অভ্যাস নেই তাদের তা না করাই ভাল। আর এসব ক'দিনের জন্তই বা! ছোট মেয়েটাকে লক্ষ্য ক'রে বলে, মাসী তো তোদের গেল বলে।

ক্রমে ময়না বুঝতে পারে কথাগুলোর অর্থ আর যা-ই হোক ঠাট্টা নয়।

এরপর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেও একটা কেমন যেন অসামঞ্জস্যের ভাব ফুটে ওঠে। কোনদিন রাত্রে ভাত কম পড়ে, কোনদিন ছালুন নাকি মোটেই থাকে না।

ময়না তবু বুঝে-বুঝে অবুঝের ভান ক'রে পড়ে থাকে। তার প্রথম প্রথম সংসারটি বড় ভাল লেগেছিল। কেমন বন্যজীবন ছেড়ে ওরা ধীরে ধীরে অন্য একটা জীবনে পা বাড়াচ্ছে! নতুন নতুন আদবকায়দা শিখছে—শেখাচ্ছে ছেলেমেয়েদের! সঙ্গে সঙ্গে কখন যেন নিজের অজ্ঞাতে তার হৃদয়ের স্নেহের দুয়ারখানা খুলে ঢুকে পড়েছিল হাস্যমুখর মহুয়ার ছেলেটি।

আজ তাকে ঠেলে বার করে দিয়ে তার চলে যেতে হবে এবং তা খুব তাড়াতাড়িই করতে হবে—নইলে অপমান অনিবার্য।

ময়না কী বোকা! এর মধ্যে সে মনে মনে ক্ষুদ্র শিশুটিকে বিয়ে দিয়েছে। তার সমস্ত গয়না দিয়ে পুত্রবধূকে সাজিয়েছে। হ্যাঁ, পুত্রবধূ বই কি? মাসী এবং মা'তে এমন একটা তফাৎ সে তো কখনও কল্পনা করেনি। মহুয়াও এর মধ্যে যতদূর সম্ভব ইন্ধন জুগিয়েছে। এখন সে-ই আবার বিবাদী হয়েছে। ময়না কী বোকা! এদের অন্তরটা না বুঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে একান্ত আন্তরিকভাবে।

ওরা চেয়েছিল স্নেহের টোপ ফেলে সোনারূপোর মাছ ধরতে।

ময়না তা বোঝেনি—ময়না কী বোকা!

অবস্থা সংগীন বুঝে ময়নাই একদিন প্রস্তাব করে। বাহাদুর তাড়াতাড়ি নৌকাখানা একটা ছোট খালের মধ্য থেকে টেনে বড় খালে এনে দেয়। মহুয়া আনে ঝাঁপি দু'টো খালপাড়ে এগিয়ে। মেয়েটা বোঁচকাটা তুলতে পারছিল না, তবু মার ইসারায় টেনে বার করে কুঁথতে কুঁথতে।

ময়না সব সাজিয়ে নেয়। নৌকায় উঠে সে বোঁচকা খুলে মহুয়াকে দেখিয়েই কষে বাঁধে—যেন বাঁধন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, তাই একটু গিট দেয় শক্ত ক'রে।

মহুয়ার তো চক্ষুস্থির। সব গয়না ছিল ঐ ময়লা পোটলাটায়! তার বিছানায়

পায়ের ধারেই তো গড়াগড়ি গেছে এতদিন। অমনি মূল্যবান একটা সামগ্রী যে ধূলায় অবহেলায় পড়ে থাকতে পারে সে তা ভাবতেই পারেনি!

ময়না চলে যায়—শুধু ছোট্ট একটা সোনার আসরফি দিয়ে যায় ছেলেটার হাতে! একটা আসরফি দিয়ে সে হাজারটা চুমো খায়। আজ আর মহুয়া কিছু বলে না।

রাত্রে বাহাদুরের হামানদিস্তা কামাই যায় না—অবিরত ঝপাং ঝপ ঝপাং ঝপ্ শব্দ হ'তে থাকে।

বাহাদুর ভাবে—

হামরা কী বোকা! হামরা কী বোকা!

[সাতাশ]

এর কয়েকদিন আগের কথা বলছি—

যোগাড়যন্ত্র কম হয়নি। চ্যবন-প্রাস প্রায় সেরখানেক কি তারও বেশি হয়েছিল। গোপী নয়ন ও তার মামীকে এক এক মাত্রা চাখতে দিয়েছে এবং বলে দিয়েছে সপ্তাহকাল পরে ফল লক্ষ্য করতে। অয়স্কান্তর মতো রূপ হবে।

ওরা সসম্ভ্রমে এমন চেটে-চুটে খেয়েছে যে হাতে একটু চিহ্নও রাখেনি ওষুধের।

আসল কথা অনেকদিন গুড় বাড়ন্ত—এখন তো পেয়েছে মধুর স্বাদ!

প্রথমদিন রাত্রে ওষুধ খেয়ে গোপী অত্যন্ত আরাম বোধ করে। সে হিসাবের বস্তানী খুলে নয়নকে কাছে ডাকে। দেখিয়ে দিতে থাকে আজ পর্যন্ত সে কত মোটা সুতো কিনেছে—কতখানা শাড়ি গামছা কখন্ কি দরে

বেচেছে। নয়নের জন্মের বহুপূর্বের হিসাব। পাকা কালি দিয়ে হাঁসের পালকের কলমে লেখা। কড়াক্রান্তিটি পর্যন্ত বাদ যায়নি। এত বড় কর্কশ গোপীর হঠাৎ মুখ দিয়ে যেন মধু ঝরতে থাকে। সে এ-জীবনে কারুকে তার মনের কথা বোঝাতে পারেনি। কতবার নয়নকে এবং তার মামীকে বলেছে কিন্তু তারা কান দেয়নি। তারা মনে মনে ভেবে রেখেছে যে, বুড়ো একটা পিশাচ। যেমন দেখতে তেমন লিখতে। কিন্তু তা নয়। সে না খেয়ে খেয়ে হৃদয়ের রক্ত জমিয়ে এ-সংসার গড়েছে। তার নজির এই পোকায় খাওয়া কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়! সে আজ পর্যন্ত যেখানে যা দান ধ্যান করেছে তারও একটি হিসাব দেখায়। আজ এক পয়সা শীতলা-পূজায়, কাল এক আনা বারোয়ারী কীর্তনে, পরশু দিন অমুকের মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচ ছটাক আতপ চাল—একুনে বিরাশী টাকা আট আনা। যখন গোপী দিয়েছে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়ে নিয়েছে—কিন্তু এখন? যার পুঁজি মাত্র কমবেশী পঁচিশ টাকার রং এবং সুতো সে হিসাব না ক'রে সংসার চালাবে কি ক'রে? দেউলিয়া হয়ে গেলে লোকে ভাল বলত, কিন্তু খেতে দিত কে?

আজ এই যে দুর্দৈব এসেছে, কেউ কি একটিবার এদিকে ফিরে তাকিয়েছে? কেউ না। মুখে আহা-উহু হয়ত কেউ কেউ করেছে তাতে মাথার ঘায়ের কি? এই গাঁয়ের প্রায় সব ঘরের বুড়ো কুকুরগুলোই গোপীর মতো।

ওরে ঘেউ ঘেউ কি সাধে করে, মাথার ঘায় কুকুর পাগল।

মামা তুমি থামো—তোমার শরীল অসুস্থ। কাইল আবার হিসাব দেখাইও।

ভয় নাই, ভয় নাই, আমি মরুম না।

আবার গোপী চ্যবন-প্রাসের ব্যাখ্যা আরম্ভ করে এবং রাত যত বেশী হয় তার ব্যাখ্যাও তত বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে জ্বর।

দুপুররাত্রে হঠাৎ জ্বরও ছেড়ে যায়, ব্যাখ্যাও কমে যায়।

গোপী একরকম সজ্ঞানেই মারা যায়। কিন্তু মৃত্যুকালেও তার এতখানি হিসাব ছিল যে আসল সংবাদটি কারুকে ব'লে যায়নি।

হয়ত তার সংজ্ঞা ফিরতে পারে...

মামী গোপীর পায় মাথা কুটে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছে। শ্মশানবন্ধুরা শব নিতে এলে মামী মামার পা-জোড়া ছেড়ে দেয়—দিয়েই লাফিয়ে শিয়রের বালিশটা বুকে গুঁজে বেদম চেঁচাতে থাকে। কেউ আর ওটা চাইতে সাহস পায় না।

পরের দিনই মামী তার ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। যাওয়ার সময় অরক্ষণীয় খড়ের ঘর দু'খানা দান করে যায় নয়নকে। তুই থাকিস, ভিটাটা যেন আন্ধার না থাকে। তোর মামার ভিটা!

মামীর অবস্থাটা ভেবে নয়ন একটু কাঁদে। একেবারে খালি হাতেই তো চলল!

কথাটা ঠিকই।

মামীর হাত দু'খানা খালিই ছিল—কিন্তু তলপেটের কাছটা বোঝাই!

কারণ গোপীর হিসাবের আসল সূত্রটি মামী টের পেয়েছিল। জমা ক'রে নিয়েছে কাপড়ের তলে।

মেয়েলোকের কাণ্ড—বিশেষত সদ্য বিধবার—শক্ত বাঁধন দিতে গিয়ে ফস্কা গেরো দিয়ে বসে।

নৌকায় উঠবে। তখনও জোয়ার হয়নি। খাল শুকনা। যেমন জল তলায়, তেমনি নাও নিচে। যেতে হবে একখানা মরা খেজুরগাছের সিঁড়ি বেয়ে নেমে। মামী নামতে গিয়ে প্রায় পড়ে যায়। কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে নয়নকে ধরে। কিন্তু বেসামাল হয়ে যায় কাপড়-চোপড়। টাকার পৌটলাটা খালের চরে পড়ে যায়।

নয়ন, গেল, গেল, দোক্তার পৌটলা—ধর।

নয়ন তাড়াতাড়ি কাদায় নেমে পৌটলাটা তুলে দেয়। ওতে কি?

দোক্তা।

এত ওজন! কও কি? দেখি?

মামী পোঁটলাটা নিয়ে চকিতে নৌকায় ওঠে এবং হঠাৎ উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দেয়, ওগো দেইখ্যা যাও তোমার নয়ন আমারে বিশ্বাস করে না।

মামীর নির্লজ্জ চীৎকারে নয়ন বিরক্ত হয়ে আর কিছু বলে না। কিন্তু আশ্চর্য ছিল তার মামাটি। ধুকতে ধুকতে মরেছে, তবু একটি পয়সার ওষুধ খায়নি। নিজেকে বঞ্চনা ক'রে যে দু-একশো টাকা জমিয়েছিল তা এখন নিয়ে যাচ্ছে মামী! ঐ টাকা মামীর ভোগেও লাগবে না। খাবে ওর ভাই। যদি মেয়েটার জন্যও থাকত তবু মন্দ হ'ত না।

ঠিক হিসাব করতে গেলে ঐ টাকার আংশিক অংশ নয়নেরও প্রাপ্য। কিন্তু যেমনি গোপী মরল অমনি নয়ন পর হয়ে গেল। একবার ফিরেও চাইল না মামী। নয়নের বয়স আছে, শক্তি আছে, ও আর উপোস করবে না! কিন্তু মামীর কি উচিত হয়েছে ওর কাছে এ সব গোপন করা? ধন্য মেয়েলোক!

মামার ওপর নয়ন চিরদিনই বিরক্ত ছিল—তাই মামী যখন যা বলেছে তখনই তা করেছে, কিন্তু আজ মামীর ওপর একটা নিদারুণ ঘৃণা জন্মায়।

এতদিন সে শুধু ভূতের বেগার খেটেছে! বেগার খাটার মধ্যেও একটা বোধহয় যশ আছে এবং সহানুভূতি করে দশজনে। কিন্তু এ খাটুনির মধ্যে কি আছে? গোপীমামা ওকে কলুর বলদের মতো ঘানিতে ঘুরিয়ে শুধু চারটি খেতে দিয়েছে। আর তো কিছু করেনি ওর জন্য! তেল যা চুইয়েছে তা ভাঁড় সমেত মামী নিয়ে যাচ্ছে। কিছুই দিয়ে গেল না।

নয়নের চোখের ঠুলিজোড়া যেন হঠাৎ খুলে পড়ে আজ ভোরবেলা খালপাড়ে এসে। এর চেয়ে মন্দ কি ছন্নছাড়া বেদিয়া জীবন? কিসের জাত, কিসের ধর্ম, কিসের মান অভিমান? ও সাপুড়ে হবে, দেশে দেশে সাপখেলা দেখিয়ে বেড়াবে। ও চুরি ডাকাতি করবে না—শুধু বাঁশী বাজিয়ে এগিয়ে চলবে। আঁকাবাঁকা গাঁয়ের পথ ধ'রে কত নদী নালা পাড়ি দিয়ে পাহাড়ী দেশের কোল ঘেঁষে—ও শুধু এগিয়ে যাবে দেশ থেকে দেশান্তরে।

কিন্তু ওর ময়নাদিদি কই? শ্রাবণ তো গেল ব'লে—ভাদ্র আসবে ভরা

আঁধিয়ার নিয়ে, তখন নাকি সব মন্ত্রতন্ত্র জাগবে। কিন্তু সব জাগরণই তো বৃথা হবে—ওর ময়নাদিদি কই?

কে শেখাবে ওকে কালনাগিনী, দুধরাজ, পদ্মরাজ, শংখচূড় বশের মন্ত্র?

যেমন করেই হোক, যতদূরেই গিয়ে থাক, ও ওর ময়নাদিদিকে খুঁজে বার করবে। না হয় রাজাসাহেবের বহর পর্যন্ত যাবে—না হয় আরও দূরে!

নয়ন কারুকে কিছু না ব'লে পাশের বাড়ির একখানা ডোঙা সোঁতা খালের বুক থেকে ঠেলে বার ক'রে বড় খালে ছেড়ে দেয়। একখানা বৈঠা টেনে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

নয়ন নৌকা ঠেলছে, এগিয়ে গেছে অনেক দূর। হয়ত বাস্তবিকই যেতে হবে রাজাসাহেবের বহর পর্যন্ত। হয়ত একটি পরিচিত মুখের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

সে তার শুধ…

শ্রাবণের মেঘলা আকাশ। কখনও একটু পরিষ্কার হয় কি হয় না আবার অন্ধকার ক'রে আসে। বর্ষা নামে বড় বড় ফোঁটায়। আবার আসে, আবার আসে আঁধার ক'রে। দু'পারে ধানী জমি—মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে খাল চলেছে। নানাদিক থেকে সোঁতা খালগুলো ঘোলা জল নিয়ে বড় খালে এসে মিশেছে। বড় খালও তেমন বড় নয়—শুধু নামে বড়। তবু কত তার মোহনা, কত তার শাখা-প্রশাখা! মাঠ থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে পাড়ায়—একেবারে বৌ-ঝিদের রান্নাঘর, অনাচ-কানাচ পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে অনেকে ঘাটে আসে না, ঘরে বসেই বাসন-কোসন মাজে। স্নানের সময় দু'পা এগিয়ে ডুব দিয়ে ঘরে ফেরে।…

তেমনি একটা খাল দিয়েই ছোট্ট একখানা নাও বাঁক ফেরে—স্রোতের চোটে হাতের বৈঠা বেসামাল হয়ে একেবারে চরকিত মত ঘুরে যায় নৌকা।

কেয়াবনের পাশ ঘেঁসে আর একখানা নৌকা আসছে।

বাহারী নাইয়া!

নয়ন চমকে ওঠে। বুইনদিদি ?

কে রে, লয়ন ? ময়নার কথা বলতে যেন কষ্ট হয় ! তার কণ্ঠস্বর এর মধ্যেই ভিজে উঠেছে।

নয়নও চুপে-চাপে এসে ময়নার ডোঙাখানার পাশে নিজের ডোঙাখানা ভিড়ায়। পাড়ের কেয়াবন ছাতির মত ছড়িয়ে পড়েছে খালের দিকে। তার নিচে নয়ন ও ময়নার নাও, ওপরে ভিজা আকাশ। নিচে ভিজা-পৃথিবী। দু'জনেই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।

কোথা যাবিক ? চল্, ঘরে চল্। হামি আর কোনখানটিতে যাবেকনি পদ্মদীঘি ছেড়ে।

ময়না কেমন ক'রে যেন নয়নের মনের কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। সে আবার বলে, চল্ লয়ন।

খাড়াও বুইনদিদি, একটু সুস্থ হইয়া লই।

দু'খানা নাও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্রোতের জলে কাঁপতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে নয়ন বলে, চলো বুইনদিদি। কিন্তু তুমি—একটু খাড়াও।

একে একে নয়ন ময়নার নৌকা থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিজের নায়ে তুলে আনে। ময়নাকেও আসতে বলে। তারপর সে জলে নেমে ক্ষুদ্র ডোঙাখানা তার অপেক্ষাকৃত বড় ডোঙাখানার গলুইতে তুলে নিয়ে পিছনে এসে ব'সে ভারসাম্য ক'রে বাইতে থাকে। এবং বেশ সহজ সরলকণ্ঠে মামা ও মামীর কাহিনী খুলে বলে।

তুই আর কোথাও যেতে পারবিকনি ! হামার কাছটিতে জনম যুগ থেকে যাবিক। কি, পারবিকনি ?

পারুম বুইনদিদি—খুব পারুম।

কি করবিক রে সমাজ স্বজন দিয়ে যদি সুখ না মিলে—সব পাজি, সব খারাপী আছেক। তোর ডর কি সমাজের ? কে আছেক তোর

দুনিয়ায় ? হামারও তো কেউ লেই। আর, একখানি বাসা বেঁধে লিবিক হামার পাশটিতে। থাকবিক চুপ সে, যাবিনি কোনখানটিতে।

তাই চলো বুইনদিদি—তাই চলো। আমারও আর কিছু ভাল লাগে না।

ধীরে ধীরে নয়ন বৈঠা বাইতে থাকে। ময়না একটা নারকেলের মালা দিয়ে নৌকার জল হেঁচকে ফেলতে থাকে নীরবে। ওদের মতো আরও দু' একখানা নৌকা ওদের পাশ কাটিয়ে যায়, কিন্তু কেন জানি কোন প্রশ্ন করতে সাহস পায় না ওদের মুখের দিকে চেয়ে। আবার বর্ষা নামে। দু'জনে যে দু'খানা কলাপাতা মাথায় দিয়েও আত্মরক্ষা করবে সে লিপ্সাও ওদের থাকে না। জলে, জলে সব ভিজিয়ে একাকার ক'রে দিয়ে যায়। ময়না শুধু হাত বাড়িয়ে সাপের ঝাঁপি দু'টো ঢেকে রাখে।

বুইনদিদি জগত অসার। কেউ কারো মনের ব্যথা বোঝে না। যে যার স্বার্থ নিয়া চলে।

সে কথা ঠিক। ময়নাও এতদিন ধ'রে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে এসেছে। সে সাধু সঙ্গের জন্য শিথল ভজন, তার এখন কোন প্রয়োজন নেই। বুকের দারুন দাহ নিয়ে গেল ভগ্নীর কাছে। তাদের জন্য অনেক করল, তপ্ত বুকে একটু জড়িয়ে ধরল ছেলেটাকে, তাকে ওরা কেড়ে নিল। জগত অসার বইকি, অসার বিশ্ব চরাচর।

যার কথায় যা করবা সব যাইবে জলে।

সেঁউতি দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে ময়না ভাবে নয়নের এ কথা এক বর্ণও মিথ্যে নয়। তার গেরুয়া বস্ত্র গেরুয়া মন আজ হয়েছে নিতান্ত অকারণ।

ভাই চুপ কর্, চুপ কর্। আর সইতে পারবেকনি তোর দুঃখের কথা। দিলের মিল পাওয়া এ দুনিয়ায় বড় ভার রে !

নৌকা ভাটিয়ে চলে। ময়নার হাতের মালা আর জিরায় না।

তার বুকের ভিতর বোধহয় এমনি জল জমেছে। উদয়-অস্ত সেঁউতি চালালেও বোধহয় তা ফুরাবে না। তবু ভাঙা নাও বেয়ে বেড়াতে হবে

জীবনের নদী দিয়ে। পথের সমাপ্তি নেই, তবু বাইতে হবে। কাঁদতে হবে আর বাইতে হবে। কেন দেখা হয়েছিল তার নিষ্ঠুর সাধুর সঙ্গে? কেন? বেদিয়া-বালা ছিল তো নিরালায়। ছিল তার পদ্মদীঘি ও নির্জন জমিদার-বাড়ি নিয়ে। তারা তো তাকে কোন কষ্ট দেয়নি। তরুলতা, ভাঙা ইমারত কোন দাগাও দিতে পারত না তাকে। মানুষ দ্বিপদ তো নয়, শ্বাপদ। বিপদ ঘটায় পলে পলে।

ময়নার খুব অসুবিধা হচ্ছে দেখে নয়ন একটু হাত চালিয়ে বাইতে শুরু করে। দুপাশের কৃষকেরা সময় সময় হাল থামিয়ে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। একখানা নৌকার ওপর আর একখানা, ব্যাপার কি? নায়ের মাঝখানে একটি বৌ। ঠিক বৌও নয়—একটি মেয়েলোক, পরনে ছাপার শাড়ি। পিছনের চলনদারের সঙ্গে যেন ঠিক সংগতি নেই মেয়েলোকটির। ঠিক বিধবাও নয়, কোন মুসলমানের মেয়েও নয়, বিধবা হলে পরনে থাকত সাদা থান, আর মুসলমানের মেয়ে হলে সে থাকত পরদানসিনা। অথচ দু'জনের মুখের ভাব প্রায় একই রকম।

একটু পার হমু ভাই। একজন পথিক দূর থেকে হেঁকে বলে। একটু পার কইরা দিয়া যাও।

জায়গা নাই। দেখ না ছোট নাও, বোঝাই কত!

অনেক সোমায় খাড়া আছি, একটু দয়া কইরা ওপার ফেইলা দিয়া যাও। যামু অনেক দূর।

কোথায়?

কদমপুরের হাটে।

আর এক নাও দেখ—আমি পারমু না।

ক্যান্ পারবা না! তুমি কখনো ঠ্যাকো না? তখন—

এ তো ভালো জ্বালা! আমি পারুম না তবু জোর—স্যাষকালে ডোঙাখান ডুবুক আর কি!

লোকটা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে। ময়নাকে দেখে সে লজ্জা পায়। ও, আগে কইতে হয়—আগে বোঝলে কি আমি আর দৌড়াদৌড়ি করতাম। সঙ্গে মাইয়া মানুষ!

দে লয়ন—একটু পার করে দে।

নয়ন বিরক্ত হয়ে নাও ভিড়ায়।

লোকটা অতি সতর্কভাবে কোনরকমে গলুইতে বসে—পা দু'খানা জলেই ঝুলিয়ে রাখে।

আরে বাইদ্যাদিদি যে! যাও কই, কেমন আছো? ভাল কইরা এখন আর চৌক্ষে ঠাহর পাই না।

তমালতলার বাসায় যাবেক। তোমাকে তো চিনলেকনি বাবা? কোন্ গাঁয়ে ঘর?

তা আর চিনবে কেন ময়না। ওরা থাকত বাপে-ঝিতে ঐ বুড়োর বাড়ির কাছে একটা নৌকায়, ঝাঁকড়া একটা জিলগাছের তলে। যখন জোয়ার আসত বুড়োর বাড়ির পাশের নদীতে তখন ময়না ও তার বাবা নাকি বঁড়শী ফেলত—নদীর এপার ওপার জুড়ে। কত মাছ ধরত তারা, কত মাছ মাগনা বিলাত চেনা-শুনা লোককে। সময় সময় কি সুন্দর গান গাইত ময়না। ছুটে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরত। ময়না না চিনতে পারলেও বুড়ো ঠিক চিনেছে ওকে, ওর গালের টোলটি দেখে। বুড়োর নাম মোহন দেউড়ী, বাড়ি উত্তরপাড়া।

ময়নার সব মনে পড়ে। লোকটার এমন চেহারার পরিবর্তন হয়েছে! কি শক্তিশালী মানুষ—এখন এতটুকু ঠুকঠুকে বুড়ো হয়ে গেছে! ময়না হাজারটা প্রশ্নে বুড়োকে অস্থির ক'রে তোলে।

ব্যাপার আর বেশি কিছু নয়, তার একমাত্র ছেলে তাকে ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেছে, তার একমাত্র প্রিয়জন!...

লোকটা অনেকখানি এগিয়েই নৌকা ছেড়ে ওঠে। ময়না তাকে যেতে

দিতে চায় না, কিন্তু সে তা শোনে না। মোহন আর কোন বন্ধনে পা দেবে না, তার দাঁত ভেঙেছে।

বুইনদিদি, তুমি বড়ো শুকাইয়া গেছো। কি হইছিল তোমার ?

ঐ দেখ, একটা মরা গাছ, ঠোক্কর লাগবেক—সামাল।

নয়ন তাড়াতাড়ি সামলে হাল ধরে—নৌকা এখন খুব বেগে ভাটিয়ে যাচ্ছে।

ময়না প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু মনে পড়ে মোহনের মুখ, প্রিয়জনহারা বৃদ্ধের শীর্ণ চাহনি !

কখন যেন পদ্মদীঘির পাড়ে এসে নৌকা থামে।

ময়নাকে উঠতে বলতে গিয়ে নয়ন দেখে যে ময়না সংজ্ঞাহীনা !

নয়ন বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থাকে।

[আটাশ]

মূর্ছিতা ময়নাকে নিয়ে বিপদে পড়ে নয়ন। চারদিকে চেয়ে দেখে এমন কেউ নেই, যে তাকে সাহায্য করবে। আকাশ ভেঙে আবার জল আসে। এবার আর দেরি করা যাবে না, নয়ন ময়নার শক্ত দেহখানা তুলে নিয়ে বাসার দিকে চলে।

সহজ দুঃখে ময়না সংজ্ঞা হারায়নি। চিরচঞ্চলা যাযাবরীর বুকের ভিতর যে কোমল মনটা আছে তা সর্বনাশা ক্ষতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবার উপচে উঠল বৃদ্ধের প্রিয়জন-বিরহের কাহিনী শুনে। আর সামলাতে পারেনি ময়না।

নয়ন চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতেই অল্পসময়ের ভিতর ময়না উঠে বসে। একটু লজ্জা বোধ করে নিজের অসংলগ্ন বেশভূষা দেখে। এলোচুলের গোছাটা কোনোরকমে সামলে নিয়ে সে বলে, এত পানি ঝরছেক ! আসমানটি ফুটা হয়ে গেলেক নাকি ?

এখন তো খুব কথা বাইর হইছে। যে ভয় দেখাইছিলা! আমি তো ভাবছিলাম কাম হইছে বুঝি!

নয়ন, হামি মরলে কি হোত?

কি আবার হইবে—ভালই হইত।

এই পদ্মদীঘিটি তুই ভোগদখল করতিক—মাছ ধরতিক, ফুল তুলতিক, আর মা-মনসাকে সাঁঝবাতি দেখাতিক।

আর হাটের থিইকা ভাল ভাল জিনিস আনাইয়া রাঁধাইয়া-বাড়াইয়া খাইতাম।

ঠিক ভাই, ঠিক। ভাওনা-ঝামেলা তোর তো সব চুকে যেতেক।

কিসের ভাবনা, কিসের ঝামেলা আমার—আমি তো গান গাইতাম আর ভাত রাঁধতাম।

ওই তো হামি চাই দেবতার কাছটিতে। তোর—

আমার সুখ—না বুইনদিদি?

হুঁ।

তবে তুমি মর—আমি পালাই। রুদ্ধকণ্ঠে নয়ন উঠে দাঁড়ায়।

ময়না তার হাত চেপে ধ'রে কাছে টেনে বসায়। এত্তা রাগ আবার চোখে পানি! তুই না মরদ আছিস্—ইয়া জোয়ানী? হামি মরবেকনি পাগলা, মরবেকনি। হামার নছিবে বহুত দুঃখ লিখেছেক ভওগবান।

তুমি চুপ করো—চুপ না করলে এখনি পালামু।

এরপর ময়না বাধ্য হয়ে চুপ না ক'রে পারে না।

আকাশে জল ঝরছে—ব্যাংগুলো যেন করুণ ঐক্যতান ধরেছে।

এরপর দিন দিন ময়নার শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। মাঝেমাঝেই তার কারণে-অকারণে ফিট হয়। তবু সে নিজের দুর্বলতা নয়নের কাছ থেকে প্রতি-নিয়ত গোপন করে। সে ওই শরীর নিয়েই চেষ্টা-তদ্বির ক'রে নয়নের জন্য তার পাশেই একখানা বাসা তুলে দিয়েছে—পৃথক সিঁড়ি আর দেয়নি, দিয়েছে

ক'খানা আধচেঁরা বাঁশ নিজের বাসার থেকে ওর বাসার চালির উপর ফেলে—ঠিক হাত দেড়েক চওড়া সাঁকোর মতো।

নয়ন ওখানে বসেই ছিপ ফেলে। যখন ভাল লাগে না, মাছে বঁড়শি আর খেতে চায় না, সে একখানা কোঁচ নিয়ে উঠে যায় এবং দীঘিটার চারপার প্রদক্ষিণ ক'রে আসে। কোনোদিন শিকার জোটে, কোনোদিন সন্ধ্যা হয়ে যায় তবু সে বকের মতো হেউলী-হোগলার ঝোপের আবডালে দাঁড়িয়ে থাকে। এই যে মাথার ওপর দিয়ে রোদ বৃষ্টি যায় সেদিকে খেয়াল নেই।

এক একদিন ময়না ডাকাডাকি ক'রে হয়রান হয়ে শেষকালে বকাবকি আরম্ভ করে। তখন হয়ত শ্রীমান হাসতে হাসতে বাসায় এসে ওঠে। ময়না তো ত্রাসে অস্থির—যেমন সাপের ভয়, তেমনি অসুখ-বিসুখও তো হ'তে পারে।

বুইনদিদি তুমি ক্যাবল ভাবো, মিছামিছি যত চিন্তা!

ময়নার তো কারুর জন্যই চিন্তা নেই। যাক, ওসব বাজে কথার দরকার নেই এখন!

সেদিন বৃষ্টিটাও বেশ ধরেছে, ময়না আঁকশিটা দিয়ে টেনে টেনে কয়েকটা পদ্মফুল তুলেছে—একটু আগেভাগেই যেন এ ফুল ক'টা ফুটেছে। কেমন লাল টুকটুকে ফুল! সে সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে ফুল ক'টা একটা পদ্মপাতায় ক'রে নিয়ে চলে মণ্ডপের দিকে। নয়নকে বাকী জিনিসগুলো নিয়ে আসতে বলে—দুধ-কলা পাঁজাল পিলসুজ।

নয়ন দেখে আজ তার ময়নাদিদি একটু কেমন যেন ঘাগরার মতো ঘুরিয়ে নতুন ক'রে তার ছোপান সেই গেরুয়া শাড়ি পরেছে। খোপায় গুঁজে দিয়েছে একটা পদ্মকলি। হাতে তার দীপাধার, পায়ে ঘুঙুরের মতো মল—নিতম্ব বেষ্টন ক'রে রয়েছে চকচকে 'রেট', যেন রূপোর গড়া পূর্ণযৌবনা এক নাগকুমারী।

আজ দুপুরবেলা মা তাকে স্বপ্নে আদেশ করেছে, সে যদি কুমারীর মতো নিষ্পাপ হৃদয় নিয়ে আরতি করতে পারে—গাইতে পারে মনসা-মঙ্গল, দেবী

তা হ'লে ওর সমস্ত সন্তাপ হরণ ক'রে নেবে। ওর স্বাস্থ্য এবং আয়ু হবে বেহুলার মতো—যে বেহুলা একদিন ছিল স্বর্গের নর্তকী, নাম ছিল ঊষা।…হঠাৎ ছন্দ কেটে যায়—অভিশাপ দেয় শূলপাণি।…

নয়ন বিস্মিত হয়ে থাকে। এ তো তার ময়নাদিদি নয়—স্বর্গ থেকে কে যেন নেমে এসেছে সন্ধ্যার আঁধারে মেঘলোকের সিঁড়ি বেয়ে।

ময়না আরতি আরম্ভ করে।…

প্রথম ধীরে ধীরে ঢুলে ঢুলে—একহাতে তার ধূপাধার অন্য হাতে পঞ্চপ্রদীপ। তারপর দ্রুততালে—তারপর আরও দ্রুত বাজতে থাকে পায়ের ঘুঙুর, কাঁপতে থাকে হাতের প্রদীপ। একখানি পাগলা ঘূর্ণিহাওয়ার মতো ঘুরতে থাকে গেরুয়া শাড়ির ঢেউ।…

ময়না গান ধরে…

যে গানে বেহুলা পাগল করেছিল শ্মশানচারী শিবকে, সেই সুমধুর গান। কোটি কোকিলের কণ্ঠ কে যেন ঢেলে দেয় ময়নার কণ্ঠে আজ। পদ্মদীঘির অন্ধকারে গলে গলে ঝরে পড়তে থাকে মূর্চ্ছনা। ময়না আকুল হয়ে ডাকতে থাকে তার বৈরাগী শিবকে—সকল সন্তাপহারী ভৈরবকে।

ময়না পাগল হয়ে নাচছে…

ছড়িয়ে গেছে তার এলো চুল—খুলে পড়েছে শাড়ির আঁচল—ধূপ দীপাধার অনেক আগেই নিবে গেছে। তবু ময়না অন্ধকারে নাচছে…

প্রলয় নৃত্য…হাতে তার সেই মুদ্রা, সেই হিল্লোল…চোখে নেমেছে মহাপ্লাবন…

নয়ন চেয়ে চেয়ে দেখে অস্থির হয়ে যায়। আজ ওর ময়নাদিদি মরবে। নয়ন কতবার উঁচু গলায় ডেকে ডেকে বলে, বুইনদিদি থামো, থামো—ও বুইনদিদি, তোমার পায়ে পড়ি একটু থামো।

কে আর কথা শোনে—ময়না নাচছে, যেন উন্মাদিনী প্রিয়জনহারা বেহুলা। দ্রুত পায়ের তালে যেন আগুন জ্বলছে অন্ধকারে। এখনি বেহুঁশ হবে ময়না।…

হঠাৎ নয়ন দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হয়ে ময়নাকে জড়িয়ে ধ'রে থামায়। ময়না অজ্ঞান হয়ে নয়নের কাঁধে নেতিয়ে পড়ে।

সকালবেলা তমালতলায় শোনা যায় ময়নার ওপর দেবী ভর করেছে—সাক্ষাৎ মা-মনসা। সকলে মনে মনে প্রণাম করে দেবীকে এবং একে একে সবাই আসতে থাকে।

দেখতে দেখতে একটা হৈ-চৈ পড়ে যায় সাত গাঁয়ে। লোকের অবিশ্রান্ত ভিড়ে নয়ন ঝালাপালা হয়ে পড়ে, এমনিতেই ময়না প্রায় অজ্ঞান হয়ে থাকে, তার ওপর এই উৎপাত। কিন্তু উৎপাত হলেও এই ভক্ত জনতাকে দূর ক'রে দিতে নয়নের সাহস হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় ময়না যা যা বলে, তাই তো দেবীর বাণী। যে যেমন আশা ক'রে আসে তাকেই তো ময়না তার ইচ্ছা মতো আদেশ-নির্দেশ দিয়ে দেয়। কেউ তো বিফলমনোরথ হয়ে যায় না।

এমনিধারা কিছুদিন যেতে না যেতেই পদ্মদীঘির পাড়ে একখানা ভাল মণ্ডপ খাড়া হয়। সমস্ত গ্রামের কুমোররা মিলে একখানা প্রকাণ্ড মনসার মূর্তি গড়িয়ে দেয়। দেবীর পরনে মেঘডম্বরু সাপের শাড়ি, হাতে-গলায়-পায় নানা-জাতীয় নাগ-নাগিনীর অলঙ্কার, কপালের সিন্দুর বিন্দুটি পর্যন্ত। দিনরাত হোম-আরতি পূজা-আর্চা চলতে থাকে। শঙ্খধ্বনি ও মধুর মৃদংগের শব্দে পদ্মদীঘির চারপার অনুরণিত হয়ে ওঠে।

ক্রমে ক্রমে বেদেনীর পদ্মদীঘি একটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়। হিন্দু-মুসলমান কোন জাতিই সেখানে এসে মানত করতে বাদ যায় না। বন্ধ্যা, খঞ্জ, অন্ধ, পুত্রহারা সকলেই আসে।

নয়ন সকলকেই তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। হাজার কষ্ট হলেও ময়নাকে নিয়ে আগলে বসে থাকে। যতক্ষণ ময়নার জ্ঞান থাকে ততক্ষণ অতিষ্ঠ হয়ে জনতা অপেক্ষা করে। সংজ্ঞাশূন্য হ'লে তার আবোল-তাবোল প্রলাপ থেকে যে যার অভীষ্ট বাণী নিয়ে বিদায় হয়।

খুব ভোরবেলা ময়নার ঘুম না ভাঙতে নয়ন পদ্মদীঘি থেকে ডালা বোঝাই

পদ্মফুল তুলে মণ্ডপে রেখে আসে। ঐ ফুল দিয়েই ময়না নিত্য-নৈমিত্তিক দেবীর পূজা করে। কোনো ধরাবাঁধা তার মন্ত্র-তন্ত্র নেই—যা তার মনে আসে তাই সে ব'লে অঞ্জলি ভ'রে ফুল দেবীর পদতলে রাখে।

এমনিভাবেই দিনের পর দিন এক নেশায় কাটতে থাকে।

কোন দিন রোদ ওঠে—কোনদিন বর্ষা নামে ঝমঝম ক'রে।

একদিন বর্ষার সাথী হয়ে আসে দমকা হাওয়া। কালো কালিন্দীর মেঘ। আজ ভাদ্রের ভরা অমাবস্যার রাত্রি! গাছ-পালা ভেঙ্গে যাবে—কত লোকের খড়ের চালা উড়ে যাবে। চারদিক একাকার। ভয়ের চোটে ডাহুকটাও ডাকছে না—একটা পেঁচাও বার হয় না জমিদার-বাড়ির এঁদো ভাঙ্গা প্রকোষ্ঠের কোণ ছেড়ে। কোন পশুরও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শুধু দমকা হাওয়া আর ক্ষেপা বৃষ্টি। বাসায় শুয়ে শুয়ে নয়ন ভাবে দৈত্যদানারা সব নেমেছে বুঝি। নামবেই তো, আজ না ভাদ্রের অমাবস্যা! নয়নের বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে— যেমন ভয়ে, তেমনি একটা কথা মনে প'ড়ে।

আজই তো জগতের সব নাগ-নাগিনীর মন্তর-তন্তর জাগবে! তাই তো ভূত-পেত্নীরা ছুটোছুটি করছে আথালি-পাথালি। গাছের মাথাগুলো বেঁকিয়ে ধরছে ধনুকের মতো!

একা একা আর বাসায় শুয়ে থাকতে সাহস হয় না নয়নের। সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখে ময়নার বাসায় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সে বিদ্যুতের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একবার চমকে উঠলে সে পাড়ি দেবে ও-বাসায়।

ঝাঁপ খুলতেই ময়না একটু চমকে ওঠে। কে রে?…নয়ন! ডর করছেক বুঝি? সে তার বিছানার পাশেই তাকে বসতে ইঙ্গিত করে।

বড় খারাপ রাত।

কিন্তু এমন একটা রাত্তির আইবে আর একটি বচ্ছর পরে।

ক্যামন্? বুঝলেকনি হামি।

নয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে বলে, না, থাউক, তোমার আর বুঝাইয়া কাম নাই। যে শরীর হইছে তোমার!

ক্যান্, কি হলেক বল্ না ভাই? হামি তো আজ ভাল আছিক। তারপর একটু থেমে ময়না প্রশ্ন করে, বল্ না গোপাল?

বড় মিষ্টি সম্বোধন। নয়নের জীবনে এমন একটা শ্রুতিমধুর কথা কোন দিন শোনেনি। তার চোখ ভ'রে উঠতে চায়।

তোর কি কামনা, কি যাচনা আছেক হামার ঠাঁই? যা পারবেক তা হামি এখনই পুরাবেক। তুই হামার ভাই ছিলিক—এখন তো ছাওয়াল হলি। কি চাহিস গোপাল?

কিছু চাই না বুইনদিদি, কিছুই চাই না—তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হইয়া ওঠো।

একটু ম্লান হাসি হাসে ময়না।

তার শরীরের যে অবস্থা তাতে দ্রুত নিরাময় হওয়া ব্যতীত আর কি কামনা করতে পারে নয়ন!

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটে। মন্ত্র-জাগা পূর্ণ অমাবস্যার রাত্রি হাজারটা গোমাসাপের মতো ফোঁসাতে থাকে?

তুই এলেম-ফুঁক শিখতে চাহিস?

না গো, কিচ্ছু চাই না—শুদ্ধ তুমি ভাল হও।

সাপ ধরতেক কোনো এলেম নাইরে—আছেক হাতসাফাই আর হুঁশিয়ারী—আর একটু জরিবুটি।

কও কি? নয়ন লাফিয়ে ওঠে। না, না, মিথ্যাকথা বুইনদিদি, মিথ্যাকথা!

হামি তোর ঠাঁই মিছা বলবেক তো সত্যিটি বলবেক কারে? আর কে আছে হামার?

তবে শিখাইবা কবে? কও, কবে শিখাইবা?

রোদ উঠুক। বুনো নাগিনী ঢুঁরে লি, তারপর তো!

ময়নার পাশে বসে নয়ন শুধু সাপের স্বপ্ন দেখে। তার ইচ্ছা করে যে এই অমাবস্যার রাতটাকে এখনি রৌদ্রদগ্ধ দিনে পরিবর্তিত করতে—ঐ জমিদার-বাড়ির সারা জীর্ণ ইঁটের স্তূপ উল্টে-পাল্টে গোটাকয়েক বুনো সাপ ধরতে। সে যে সাপই হোক, গোখরা, খয়রা কিম্বা জাতি।

খানিকবাদে ময়না বলে, তুই শুতবিকনি? এত পানি ঝরছেক যে আসমানটা ফুটা হয়ে গেলেক বুঝি। তুই থর থর করছিস ক্যান্? শীত লাগলে? হামার পাশটিতে শুয়ে পড় এই কাঁথা গায় দিয়ে।

নয়ন ইতস্তত করতে থাকে।

ময়না তার মাথায় ও গায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, মা-যশোদার কাছে কি লাজ আছে গোপালের? নয়ন, তুই ভাই ছিলিক, এখন সেবা ক'রে ছাওয়াল হলিক—হামার আদরের দুলাল। তুই জাড়ে কাঁপবি আর হামি থাকব কাঁথার কোলটিতে গরমে? সরম যদি করিস তো হামি উঠে বসি।

দ্বিতীয় কোনো শয্যা প্রস্তুতের পর্যাপ্ত বিছানা নেই, ময়না আবার উঠলে হয়ত সংজ্ঞা হারাতে পারে তাই নয়ন তাড়াতাড়ি ওর পাশটিতে গিয়ে শোয়। ময়না ওকে প্রশস্ত কাঁথাখানার একপ্রান্ত দেয় গায়ে দিতে।

নয়নের মনে যে কি ভাব হয় তা বোকা তাঁতি প্রকাশ ক'রে বলতে পারে না। ওর আনন্দে দুই গাল ভেসে যেতে থাকে। ও ময়নার একখানা হাত জড়িয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ভাঙাগলায় বারবার বলে, তুমি আমার বুইন ছিলা, আইজ থিকা মা হইলা—ও আমার বাইদ্যা মা, ময়না মা, মাগো মা!

বাইরের আকাশের সঙ্গে আজ পাল্লা দিয়ে ময়না কাঁদে নয়নকে বুকে চেপে।

অমাবস্যার রাত্রি গোঙিয়ে চলে। বিদ্যুৎ চমকায় বারবার। মন্ত্র-জাগা বহু আকাংখার নিশা গত হয়ে যায়। সব ভুলে এ মহালগ্ন কেঁদে কাটিয়ে দেয় নবলব্ধ মা ও ছেলে।

[উনত্রিশ]

ভোরের দিকে ময়না বলে, একটি কাম আছেক।

কি কাম গো?

তোকে যেতে হবেক এক ঠাঁই।

তোমাকে ছাইড়া? ও কথা মুখে আইনো না। আমি সব পারুম, ক্যাবল ঐটা পারুম না। জানো, তুমি কেমন রোগা হুইয়া গেছ? ময়নার শীর্ণ হাতখানা টেনে আনে নয়ন।

হামার দাওয়াইর লিয়েই যে যেতে হবেক।

তাই নাকি? তয় এখনই যামু, কও, কোথায় আছে কার কাছে ওষুধ?

রাজাসাহেবের ঠাঁই। তাকে গিয়ে বলবি সব, দাওয়াই দিবেক অমরী।

কিন্তু ভয় করে যে? সেবার ক্যামন্ কইরা পলাইয়া আইলাম। সে গোসা হইয়া আছে নিচ্চয়।

না রে. চাচাকে তুই চিনহিস না। হামার চিনা লিয়ে যাবিক!

এখনই তা হইলে উঠি। কাপড়-চোপড় তো গুছ-গাছ কইরা লইতে হইবে! নয়ন হনুমানের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ময়না বলে, আগে সকাল হতে দে। ময়না নিজের অসুখের জন্য পাঠাচ্ছে না নয়নকে। এ দুনিয়ায় তার ব্যাধি সারার মতো কোন ওষুধ নেই। সময় সময় তার হৃৎপিণ্ডটা এমন কাঁপে যে তার আশংকা হয় কখন যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে ঐ কলকাঠি। বড় দুর্বল লাগে শরীরটা। সে চায় একটা কিছু ঘটার পূর্বেই নয়নকে স্থিতি ক'রে এই দীঘির সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যেতে। সে মরতে চায়, কিন্তু মুছে যেতে চায় না। তাই নয়নের প্রয়োজন

একটি সঙ্গিনীর। সে এমন বেদের মেয়ে হবে যে একা একাও রাত কাটাতে পারবে এই বিলে।

শুখের কথাই ভাবছিল ময়না।

আর নয়নেরও মনে পড়েছে তার মুখখানা।

নয়ন লজ্জায় কিছু বলে না, এবং ময়নাও ইচ্ছা ক'রেই কিছু জানায় না। কিন্তু শুখ, শুকতারাটির মতোই আলো ছড়াতে থাকে দু'জনের হৃদি-দিগন্তে।

সকাল হয়—বেলা বেশ খানিকটা বাড়ে ময়নার শয্যাত্যাগ করতে। আজ আর দেবীর ভর নামে না তার ওপর। সে যেন অন্য দিনের চাইতে নিজেকে অনেক সুস্থ বোধ করে। আশ্চর্য বটে!

সে একটা কি মাছ দেখে যেন ঘর থেকে একখানা গুল্লি-বাঁশ আনে ঠিক ধনুকের মতো ছিলা দেওয়া। এ ধনুক দিয়ে তীর ছোঁড়া যায় না, যায় মেটে কিংবা লোহার গুলি চালান। সাধারণত পাখীশিকারে এই ধনুক ব্যবহার করা হয়। যদি প্রয়োজন হয় তবে মানুষও মারা চলে। মানুষ অথবা বড় বড় জন্তু জানোয়ারের জন্য লোহার, অন্যান্যর জন্য মেটেগুলি ব্যবহার করে বেদে-বেদেনীরা।

নয়ন ময়নার কাছে এসে বলে, ঐ লোকটা আমারে তোমার খসম কয়।

কী বদ্‌মাস! শব্দ হয় সটাস্‌-সট্‌। একটা গুলি গিয়ে পড়ে সেই লোকটার হাতের লাঠির ওপর। সে 'মাগো' ব'লে ছুটে পালায়। ময়না ইচ্ছা ক'রেই তার হাতখানা ভাঙে না—শুধু একটু সমঝে দেয় তাকে। লোকটা জাবেদালী। পণ্ডিত এবং আর যেন কাকে শুনেছে যদু তাঁতির বাড়ি ব'সে ঐ কথাটা নিয়ে একটা আলোচনা করতে। তাঁতিকুল থেকে দু'টি একটি কুৎসা জন্মাচ্ছে কিনা!

ময়না দেখে যে তার শিকার এই অবসরে পালিয়েছে। এখন নয়নকে

সকাল সকাল কি রেঁধে দেবে? কয়েকটা জিয়াল পাতা ছিল, তাতে যদি মাছ গেঁথে থাকে। ময়না বলে, যা বঁড়শি ক'টি তুলে লিয়ে আয় দীঘি থেকে।

তোমার হাত তো বড় সই। আমার কাছে একটু গুল্লি-বাঁশটা ছাও না। পলাতক লোকটার অবস্থা ভেবে মনের আনন্দে ছিলা টেনে নয়ন গুলি ছোঁড়ে। কৌশল আয়ত্ব না থাকার জন্য সে যে হাতের মুঠো দিয়ে ধনুক ধরে সেই হাতের বুড়ো আঙ্গুলটাই জখম হয়। উঃ! সে ধনুক ফেলে ব'সে পড়ে।

ময়না 'আহাহা' করে ছুটে আসে। আর একটু হ'লে থেঁতলে যেত আঙ্গুলটা। ময়না একটা কচুর আঁশ এনে নিজের মুখের মধু দিয়ে বেঁধে দেয়। তুই যে কি পাগল আছিস লয়ন, যা, শুতে থাক্। হামি জিয়াল তুলে লিয়ে আসি। এমন ভাবে ময়না কথাগুলো বলে যে তার হৃৎপিণ্ডটাই যেন থেঁতলে গেছে।

নয়নের এই তুঃসহ ব্যথাটাও যেন কি অলৌকিক যাতুমন্ত্রে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়। সে তার জামাকাপড় গোছাতে থাকে।

ও কি রে?

ভাল হইয়া গেছে—একেবারে সাইরা গেছে দেখ। তোমার মুখের মৌতে আর বিষ থাকতে পারে!

এত জলদি? অবাক করলি লয়ন! দেখি আঙ্গুলটি।

যে জরুরী কাজ তাতে আর ঐ সামান্তের লাইগা দেরি করা চলে?

সাধে কি তোকে পাগলা বলি হামি—সেজেছিস তো খুব লছমীমান হয়ে!

তুমি তমালতলায় যাওয়ার দিন সাজ নাই? আমি তো যাই তার থিকাও বেশি দূর—ভিন-গাঁয়ে, ভিন-সমাজে।

ময়না তখন আর নয়নকে কিছু বলে না। শুধু সস্নেহে একটু হাসে। রওনা দেওয়ার সময় সে তাকে বলে দেয়, খুব হুঁসিয়ার হয়ে নদী পাড়ি দিতে, আর

সে একগোছা পোয়াল দিয়ে একটি সাংকেতিক বেণী বুনিয়ে নয়নের হাতে দেয়—এটা রাজাসাহেবের কাছে দেওয়ামাত্র সে সব বুঝবে। অমরী ওষুধ দিয়ে দেবে হাতে হাতে।

নয়ন রওনা হয়, ময়না মা-মনসার কাছে তার মঙ্গল কামনা করে।

চক্‌চকে রোদে চর-গোখুরীর চরটা একটা নির্জীব জানোয়ারের মতো ঝিমাচ্ছে। স্থানে স্থানে বালুতে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ রত্নের রেণুকা। জ্বলছে একবার, নিবছে আবার। কি সুন্দর দেখাচ্ছে নদীপারের সুবিন্যস্ত তাল-তমাল-রসাল-বট-বাবলা! নির্মল আকাশের নীল রং পান ক'রে শ্যামল তরুমালার পত্রগ্রন্থি যেন শ্যামলে নীলে মিশে এক নতুন বর্ণ ধারণ করেছে। নয়নের চোখে বড় ভাল লাগছে দূরদূরান্তের কাশের গুচ্ছ, ঘাসের জংলি ফুল, দুগ্ধধবল বকের ঝাঁক। যখন উড়ছে তারা তখন রোদ চমকাচ্ছে তাদের শাদা শাদা নরম পাখনায়। আজ সবই সুন্দর—নদী, বালুচর, ঐ পথ ও প্রান্তর। একটা কি যেন গান গাইছে অদৃশ্য পোকামাকড়গুলো।

বহরের নিকট আসামাত্র বেদে বৌ-ঝিরা হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে। খলবল করে বেরিয়ে পড়ে নানা নাও থেকে। জামাই, জামাই এসেছেক রে, শুখের সাংগাত।

ব্যাপার কি? নয়ন বোকার মতো তাকায়। এরা এ কি ঠাহর করল তাকে? এসে ওঠামাত্রই ঠাট্টা! কিছুক্ষণ বাদেই সে বুঝতে পারে যে এ সব ঠাট্টা তামাসা নয়--নিছক সত্যি কথা। ময়না সাংকেতিক পোয়ালের বেণী তার হাতে দিয়ে এদের এখানে সংকেত পাঠিয়েছে। নয়নের ভারি রাগ হয়। সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাতের পোয়াল গুচ্ছটা। তবে ওষুধ নয়, কারসাজী। দিব্যি ং করে বললে, অমরী ওষুধ! সে আর এক তিলও এখানে দাঁড়াবে না। এক্ষুণি াবে ফিরে।

মৌমাছির ঝাঁক এসে তাকে ঘিরে ধরে। আসে ঝাঁকের রাজা রাজাসাহেব পর্যন্ত। বুড়োর মুখে সে কি হাসি! এখন দেখলে কেউ কি বুঝতে পারবে এরা বর্বর চোর ডাকুর বংশধর। রাহাজানি, মদ-রপ্তানি, ডাকাতি করাই এদের আসল পেশা। শুভ্র দাড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে ফুটে বার হচ্ছে অম্লান হাসি। রাজাসাহেব নয়নের হাত দু'খানা ধরে। ক্যামনটি আছে বেটী? এলে না যে? তুই বা ক্যামনটি আছিস বাপ? চল্, চল্ হামার লায়ে। সরবৎ লিয়ে আয় শুখ। হামার বাপধন এসেছেক। আজ বড় ফুরতির দিন আছেক রে, বড় ফুরতির দিন!

নয়ন আর সাহস পায় না কোন রাগ-অভিমান প্রকাশ করতে।

সন্ত ফোটা কি ফুলের সুগন্ধ দিয়ে যে শুখ সরবৎ প্রস্তুত ক'রে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে, তা সে-ই জানে। আমেজে রঙিন হয়ে ওঠে নয়নের মন। সে অকারণ বকবক ক'রে যেতে থাকে। রাজাসাহেবও সরবৎ খায় দু-চার গ্লাস। সেও চলে নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা ব'লে। অনেক হাসি-হল্লা ক'রে দু'জনে ব'সে।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া হয়।

রাতে আবার স্ফূর্তি।

পরদিন শুখকে বিদায় দেওয়ার আয়োজন চলতে থাকে।

আজ বৌ-ঝিরা স্নান ক'রে সেজেগুজে ওকে নিয়ে মনসা-মণ্ডপে যায়। হাতে তাদের বরণ-কুলা, পঞ্চপ্রদীপ আর ডালাবোঝাই রক্তজবা।

সবাই আজ শুভ্রশুচি। রঙ-তামাসা করতে এত ওস্তাদ যারা, তারা আজ কেন জানি ম্রিয়মান। হয়ত তাদের দলের একটিকে চিরদিনের মতো বিদায় দেবে বলেই এই আকস্মিক পরিবর্তন।

পরে নয়ন জানে তা ঠিক নয়।

যাচ্ছে ভাসান গাইতে। লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে বেহুলা আজ ভাসবে ভেলায়, ভাসবে অকূলে, ভাসবে ঘাটে ঘাটে, বাটে বাটে।

ঠিক তারপরই ময়না পদ্মদীঘিতে বসে জীয়িয়ে তুলবে লক্ষীন্দরকে। এরা ভাসাবে দিনে ময়না জীয়াবে রাত্রে, এমনি ক'রেই সাঙ্গ হবে রয়ানী গানের দু'টো পালা। জীবননাট্যের অশ্রু ও হাসিখেলা।

নয়নকে শুখের সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়ে দেয় রাজাসাহেব। রাজাসাহেবের মনটাও যেন উথলে উথলে ওঠে। শুখকে অনেক মারধর করেছে, কিন্তু স্নেহও তো করেছে অনেক। নইলে বাঁদীর ঘরের মেয়ে আর প্রত্যাশা করতে পারত না যৌতুকের। আজ শুখ সালংকারা—যেন দেবীপ্রতিমা। এ সব রাজাসাহেব অতিরিক্তই করেছে। সাধারণত কোন সর্দার বিয়ে দিয়ে হাতছাড়া করতে চায় না দাসী-বাঁদীর মেয়েকে।

যাত্রার সময় সকলেই নায়ের কাছে আসে। শুখ কিছু বলতে পারে না, শুধু কাঁদে।

রাজাসাহেব উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আর বলে, যা বেটী যা—ঘর সংসারী হ'। বুড়া বাপ আর ক'দিনের ? যা বেটি যা···

অমরী ওষধ নিয়ে নয়ন যখন ফেরে তখন বেশ গুরুগম্ভীর দেখায় তাকে। সে ময়নার সঙ্গে কোন কথা না ব'লে একদিকে বেরিয়ে যায়। ময়না ওর রকম-সকম দেখে একটু হাসে কেবল।

শুখ চিনতেই পারছে না ময়নাকে। এত কাহিল হয়ে পড়েছে এই ক'টা মাসের মধ্যে ! সে এসে তার শয্যার একপ্রান্তে বসে। তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ময়না শুধায়, ক্যামনটি আছিসরে শুখ ?

উত্তরে তার চোখজোড়া মেদুর হয়ে ওঠে শুধু। সে তো ভাল আছে, কিন্তু একি হাল হয়েছে ময়নার ? একি রোগ, না বিয়োগান্ত নাটিকার শেষ অধ্যায় ?

তুই বড় বোকা আছিস, ক্যান্ কাঁদবি আমার সুখের দিনটিতে ? আলা করে থাকবিক পদ্মের লাখান এই পদ্মদীঘির বাসা, হামার গোপালের ঘর।

আর তুমি বুঝি যাইতে চাও আঁন্দার কইয়া সব ? তাই বুঝি ভাবছ মনে ?

আমিও আজ দেখুম ক্যামন্ আমাগো জাগন্ত মনসা। যদি কথা না শোনে, তবে দিমু সব ঘট কলসী প্রিতিমা পদ্মদীঘিতে ডুবাইয়া। নয়ন এক লাফে বেরিয়ে যায়।

ওরে, শোন রে নয়ন, হামার কথা। ওসব মুখে আনলেক দোষ—শোন্‌রে, শোন্। নয়ন ফেরে না।

পাগলটা কোথায় বসে ছিল—জানলে ময়না হয়ত একটু সমঝে বলত কথা ক'টা!

শুখ, যা লো, ফিরিয়ে লিয়ে আয় বাঁন্দরটাকে। ওর কোন জ্ঞান আছেক!

এবার শুখ একটু শুধু হাসে। বাঁদর সামলানোর কর্ম নববধূরই বটে!

শুখের অবস্থাটা বুঝে ময়না নিজেই বিছানা ছেড়ে ওঠে। সে দোর গোড়ায় বেরিয়ে দেখে যে নয়ন হাতজোড় করে কি যেন বলছে দেবীর কাছে। বড় সকরুণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তার হাব ভাবে। কিন্তু একটু পরেই সে যেন শাসাতে সুরু করে পদ্মদীঘির জাগ্রত মনসাকে, যে মনসার একটি নিশ্বাসে হঠাৎ ঘটাতে পারে মহাপ্রলয়। কি লাঞ্ছনাই না পেয়েছিল চাঁদ সওদাগর!

সর্বনাশ! ময়না চীৎকার করে বলে, হারামজাদা উঠ, তোর পাখনা পুড়বেক আগুনে। এখনও ফের্, ফের্।

আর দেরি করলে হয়ত ময়না এগিয়ে আসবে—নয়ন তাই ভয়ে পিছিয়ে আসে।

রাত্রে ময়না বলে, তোর কি ডর-ভয় নেই দেবতার?

তবে অসুখ সারে না ক্যান্ তোমার?

এর জবাব তো ময়নার দেওয়ার ক্ষমতা নেই—অতএব সে নীরব থাকে।

[ত্রিশ]

প্রথম প্রথম খুবই ভাল লেগেছে শ্যামলীর। কিন্তু শেষে বিরাগ এসেছে। কতদিন আর অভিনয় করা চলে? মূল্যহীন দুর্নিবার মিথ্যাচার একদিন ধরা পড়ে।

শ্যামলী বুঝেছে যে ভৈরব সবই জানতে পেরেছে। তাই একটা লজ্জার পরদা নেমে এসেছে দু'জনের মধ্যে। তবে ভৈরব যতটা উদাসীন, শ্যামলী তা নয়। কারণ লজ্জাটা তারই হাতের রোয়া গাছের ফল।

এক-একসময় শ্যামলীর ধিক্কার জন্মে। কেন সে এমন চপলতা করতে গেল? কেন কামনার অশ্বরজ্জু সে শিথিল ক'রে ছেড়ে দিল? সে জন্মেছে বৈরাগীর ঘরে, শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে বৈরাগ্যের। তার কি উচিত হয়েছে এতটা নেমে আসা? সে শুধু নামেনি, নামাতে চেয়েছিল আর একজনকে, যে নিতান্ত নিরপরাধ।

কিন্তু সব অপরাধ কি তার?

কেন বিধাতা তাকে অবিমিশ্র মাংসপিণ্ড দিয়ে গড়ল না? কেন দিল কামনা লালসা হাসি কান্না, আর দুঃসহ ক্ষুধা? শুধু জঠরের নয়, সারা দেহের। মানুষ তো কিছু চায় না জন্মকালে। তবু কে দেয় ঘৃত ও অগ্নি সন্নিকট করে? একি, লীলা, না শঠতা? সে অনেক চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারেনি।

তবে সে এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে ভৈরব তার কাছে স্বাদহীন, গন্ধহীন ধাতুপিণ্ড। সে তাকে বারবার চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে চেয়েছে, সন্ন্যাসী আকর্ষিত হয়নি। সে ধাতু হলেও লৌহ নয়—হয়ত খাঁটি সোনা। তাকে টানা যায় না চুম্বকের বশীকরণ মন্ত্রে। কতরাত্রি তারা একত্র কাটিয়েছে, কতদিন তারা

পাশাপাশি হেঁটেছে, কিন্তু সাধু নিরাসক্ত। এ সুবর্ণ শ্যামলীর কাছে নিতান্ত মূল্যহীন।

ভৈরবকে সে আর বিরক্ত করবে না—যাচ্ঞা করবে না ভিক্ষুকের কাছে নির্লজ্জা এক ভিখারিনীর মতো। সন্ন্যাসী চলে যাক, তাকে এখানে ফেলে যাক—তার জন্য এখন আর চিন্তিত নয় শ্যামলী। দিন আসে দিন যায়—যে যেমন ভাগ্য করে, তেমনি ক'রে কাটায়। এর জন্য আর ভাবনা কি? বংশীতলা ও বৃন্দাবন তার কাছে দুই-ই সমান। সে বংশীতলার গোবিন্দজীকে দেখেও কখন মুগ্ধ হয়নি, শ্রীবৃন্দাবনে এসেও সে মূর্ছিত হবে না। তবে কারুর পথের কণ্টকও সে হ'তে চায় না। সে যে-বাড়িতে আছে সে বাড়ির ঝিয়ারী করেও জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

ভৈরব মাঝেমাঝেই চিন্তা করেছে ময়নার কথা—কি হলো, কেমন আছে সে? কিন্তু কেমন ক'রে সে যাবে শ্যামলীকে ছেড়ে? হাজার হলেও অল্পবয়সের একটা বিধবা তো! ময়নার অসমাপ্ত শিক্ষাদীক্ষার কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে তার হঠাৎ রাগ, ঠায় বিরাগ।

এই ক'দিন আগে এক আশ্রমে একটি দেশী লোকের সঙ্গে দেখা। কে, ভৈরব যে, কেমন আছ ভাই?

ভাল। তুমি কেমন আছ অনন্ত? তারপর কি জন্য এত দূর?

তুমি যে জন্যে—তীর্থ দর্শনে।

তমালতলা ও বংশীতলার কুশল তো? ভাল আছে গাঁয়ের সবাই?

হ্যাঁ কুশলে আছে সব। তবে নাকি দেশী গরুগুলোর স্বাস্থ্য তেমন ভাল না। আছে নানা রোগ পীড়া।

দু'জনে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে। অনন্ত এই অল্পদিন হয় এখানে এসেছে, শীগগিরই যাবে দেশে। সে কয়েকটি টাকা জমিয়েছিল তীর্থে আসবে

[ত্রিশ]

প্রথম প্রথম খুবই ভাল লেগেছে শ্যামলীর। কিন্তু শেষে বিরাগ এসেছে। কতদিন আর অভিনয় করা চলে? মূল্যহীন দুর্নিবার মিথ্যাচার একদিন ধরা পড়ে।

শ্যামলী বুঝেছে যে ভৈরব সবই জানতে পেরেছে। তাই একটা লজ্জার পরদা নেমে এসেছে দু'জনের মধ্যে। তবে ভৈরব যতটা উদাসীন, শ্যামলী তা নয়। কারণ লজ্জাটা তারই হাতের রোয়া গাছের ফল।

এক-একসময় শ্যামলীর ধিক্কার জন্মে। কেন সে এমন চপলতা করতে গেল? কেন কামনার অশ্বরজ্জু সে শিথিল ক'রে ছেড়ে দিল? সে জন্মেছে বৈরাগীর ঘরে, শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে বৈরাগ্যের। তার কি উচিত হয়েছে এতটা নেমে আসা? সে শুধু নামেনি, নামাতে চেয়েছিল আর একজনকে, যে নিতান্ত নিরপরাধ।

কিন্তু সব অপরাধ কি তার?

কেন বিধাতা তাকে অবিমিশ্র মাংসপিণ্ড দিয়ে গড়ল না? কেন দিল কামনা লালসা হাসি কান্না, আর দুঃসহ ক্ষুধা? শুধু জঠরের নয়, সারা দেহের। মানুষ তো কিছু চায় না জন্মকালে। তবু কে দেয় ঘৃত ও অগ্নি সন্নিকট করে? একি, লীলা, না শঠতা? সে অনেক চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারেনি।

তবে সে এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে ভৈরব তার কাছে স্বাদহীন, গন্ধহীন ধাতুপিণ্ড। সে তাকে বারবার চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে চেয়েছে, সন্ন্যাসী আকর্ষিত হয়নি। সে ধাতু হলেও লৌহ নয়—হয়ত খাঁটি সোনা। তাকে টানা যায় না চুম্বকের বশীকরণ মন্ত্রে। কতরাত্রি তারা একত্র কাটিয়েছে, কতদিন তারা

পাশাপাশি হেঁটেছে, কিন্তু সাধু নিরাসক্ত। এ সুবর্ণ শ্যামলীর কাছে নিতান্ত মূল্যহীন।

ভৈরবকে সে আর বিরক্ত করবে না—যাচ্ঞা করবে না ভিক্ষুকের কাছে নির্লজ্জা এক ভিখারিনীর মতো। সন্ন্যাসী চলে যাক, তাকে এখানে ফেলে যাক—তার জন্য এখন আর চিন্তিত নয় শ্যামলী। দিন আসে দিন যায়—যে যেমন ভাগ্য করে, তেমনি ক'রে কাটায়। এর জন্য আর ভাবনা কি? বংশীতলা ও বৃন্দাবন তার কাছে দুই-ই সমান। সে বংশীতলার গোবিন্দজীকে দেখেও কখন মুগ্ধ হয়নি, শ্রীবৃন্দাবনে এসেও সে মূর্ছিত হবে না। তবে কারুর পথের কণ্টকও সে হ'তে চায় না। সে যে-বাড়িতে আছে সে বাড়ির ঝিয়ারী করেও জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

ভৈরব মাঝেমাঝেই চিন্তা করেছে ময়নার কথা—কি হলো, কেমন আছে সে? কিন্তু কেমন ক'রে সে যাবে শ্যামলীকে ছেড়ে? হাজার হলেও অল্পবয়সের একটা বিধবা তো! ময়নার অসমাপ্ত শিক্ষাদীক্ষার কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে তার হঠাৎ রাগ, ঠায় বিরাগ।

এই ক'দিন আগে এক আশ্রমে একটি দেশী লোকের সঙ্গে দেখা। কে, ভৈরব যে, কেমন আছ ভাই?

ভাল। তুমি কেমন আছ অনন্ত? তারপর কি জন্য এত দূর?

তুমি যে জন্যে—তীর্থ দর্শনে।

তমালতলা ও বংশীতলার কুশল তো? ভাল আছে গাঁয়ের সবাই?

হ্যাঁ কুশলে আছে সব। তবে নাকি দেশী গরুগুলোর স্বাস্থ্য তেমন ভাল না। আছে নানা রোগ পীড়া।

দু'জনে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে। অনন্ত এই অল্পদিন হয় এখানে এসেছে, শীগগিরই যাবে দেশে। সে কয়েকটি টাকা জমিয়েছিল তীর্থে আসবে

ব'লে। ভেবেছিল স্ত্রীকেও নিয়ে আসবে, কিন্তু এমন মহাপাপী তার বৌ যে ঐ থেকে একটি টাকা চুরি ক'রে সে একখানা আটপৌরে খাটো শাড়ি কিনেছে। অনন্ত ভাবল সর্বনাশ, একেবারে নরকবাস করিয়ে ছাড়বে তার স্ত্রী! কত কষ্টের সঞ্চিত অর্থ তার! তাই সে আর দেরি না করে মহাপাতকিনীকে ত্যাগ করেই ছুটল তীর্থে। আরও হাজারগণ্ডা সংবাদ সে জানাল তার সংসারের।

তারপর আরম্ভ হয় গ্রামের নানা কথা। এই গোপীর মৃত্যুসংবাদ থেকে কার কার ছেলে মেয়ে হয়েছে তা পর্যন্ত বলে অনন্ত। নিজের হাল-হালুটির সংবাদও জানায়।

সাধু তো এসব ঠিক শুনতে চায় না, তবু হাসি মুখে ব'সে থাকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। নিকটেই এক মন্দিরে শংখ-ঘণ্টা বাজছে। আরতি হবে ভজন হবে। কথা ছিল অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভৈরব। অনন্তের তো মহাভারত শেষ হয় না।

ভৈরব ওঠে। অনন্ত যাবে নাকি, চলো। মন্দির থেকে ফেরার পথে আবার সব শোনা যাবে'খন।

তা ঠিক—চলো, চলো। অনেকদিন বাদে তোমার সাথে দেখা কিনা, মনটা হাঁপাইয়া উঠছিল বিদেশে! অনন্ত বলে, সাধু, দেখছ এদেশের গরুগুলা! এঁদের তুলনায় আমাদের দেশেরগুলা আর বলুম কি—মর্কট! কৃষ্ণের দেশ ভাই, প্রেমের দেশ! শতকোটি পেন্নাম এঁদের সবাইর ছিচরণে। গরুগুলোর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে অনন্ত।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে অনন্ত বলে যে তার ভুল হয়ে গেছে একটা বিশেষ সংবাদ জানাতে। ময়না বেদেনীর ওপর নাকি সাক্ষাৎ মা-মনসা ভর করেছেন। সে প্রায়ই 'দশায়' পড়ে এবং ভূত-ভবিষ্যৎ যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়। দিবারাত্রি পদ্মদীঘির পার লোকে লোকারণ্য।

কি বললে অনন্ত, ময়না মোহগ্রস্ত হয়েছে? হঠাৎ ভৈরব একটু অন্যমনস্ক

হয়ে পড়ে। এ সব তো ভাল নয়। বলতে পার তার স্বাস্থ্য কেমন আছে? সে কি এখন আর ভজন গায় না?

অনন্তও সাধুর অধীরতা লক্ষ্য করে। গান তো গাইতে শুনি না। অত মাথা কুটলে কি ভাই শরীরও ভাল থাকে? শুকাইয়া একেবারে খাক হইয়া গেছে তার দেহ।

তুমি কবে দেশে যাচ্ছ?

হাল-হালুটি ফেইলা আইছি। কতদিন আর বিদেশে থাকা যায়? আমাদের এমন ভাগ্য যে দু'দিন তীর্থে আইসাও নিশ্চিন্দে কাটাইবার জো নাই! তুমি দেশে যাবা নাকি? অতঃপর অনন্ত সশংকোচে জিজ্ঞাসা করে, লোকে যা বলে তা সত্যি নাকি ভৈরব? এই শ্যামলীর কথা, তা সে কেমন আছে? আর দেশে যাইয়াই বা লাভ কি, এখানেই তো আছ বেশ। তোমার বাসা কোথায়? একবার দেখতে ইচ্ছা করে শ্যামলীকে। শত হইলেও দেশী মাইয়া তো!

এসব কথা যেন ভৈরবের কানে ঠিক যাচ্ছে না। সে পাথরের রাস্তা ভেঙে এগিয়ে চলে।

আচ্ছা, আজ তা হইলে চলি ভৈরব। কাইল আবার এখানেই দেখা হইবে। শ্যামলীর সাথে দেখা না-ই হইল, সে যে ভাল আছে এই তো সুখের। এখন তা হইলে চলি।

না অনন্ত, এখন তুমি যেতে পারবে না, আমার ওখানেই চলো। যে ক'দিন আছ আখড়ায় কি ধর্মশালায় না থেয়ে আমার ওখানেই থাবে। শ্যামলী একটু চপল, নইলে লোকে তাকে যা সন্দেহ করে তা সত্য নয়।

অনন্ত একটু আপত্তি ক'রে শেষে রফা করে যে তার জিনিসপত্র নিয়ে কাল এখানে আসবে এবং ভৈরবের সঙ্গে যাবে। প্রাতঃপেন্নাম ভাই সাধু। তুমি সজ্জন!

আমি পারলে তোমার সঙ্গেই একবার দেশে গিয়ে ঘুরে আসবো।

সে তো ভাল কথা, খুব ভাল। শ্যামলীর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু অনন্ত জিজ্ঞাসা করে। ধ্রুবর বিষয়েও গ্রামে যে কথা রটেছে তা বলে। সাধু শুধু হাসে। এবং সেই উদার হাসিতে যা অনন্তের মনে প্রতিফলিত হয় তা গ্লানিহীন একটা মধুর সম্পর্ক। গ্রামে বসে যা ভেবেছে—এই প্রেমের তীর্থে এসে তার সে-সব ধারণা পাল্টে যায়। ওলট পালট ক'রে দিয়েছে সাধু তার সরল কথায়।

বিদায়ের সময় সাধু বলে, অনন্ত, কাল এক বার এসো কিন্তু।

গুরুর ইচ্ছা।

বাসায় ফিরে শ্যামলীকে ভৈরব বলে, ধ্রুবর তো দেখা পাওয়া গেল না।

হাজার সাধনা ক'রে, লক্ষ যোজন পথ হেঁটেও যে তার সাক্ষাৎ আমি পাবো না তাকি তোমার বুঝতেও এতদিন লাগলো? ছল ক'রে নিকটে থেকেও যদি লুকিয়ে থাকে তাকে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

শ্যামলী, আত্মবিশ্বাস হারিও না, আর অধ্রুবর পিছনে ছুটো না।

যাক্, ওসব কথা আমি শুনতে চাইনে। তোমার খাবার তৈরী।

ভৈরব আহার করতে ব'সে বলে, আমি একবার দেশে যেতে চাই।

তা যাবে। আমার জন্য তোমার কোন কিছু আর ভাবতে হবে না। ইচ্ছা হলে এসো, আর না এলেও আমি অনুযোগ করবো না। এ বাড়িতে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে আমি বেশ থাকতে পারবো।

আবার কিছুক্ষণ বাদে ভৈরব বলে, তুমি তো রাগ করলে?

না।

তবে দুঃখিত হয়েছো নিশ্চয়ই।

তাও নয় ভৈরব। রাগ-দুঃখের অবস্থা আর আমার নেই।

আমি যেয়েই চলে আসবো। ময়না নিতান্ত অসুস্থ। দেশ থেকে অনন্ত এসেছে। কাল এখানে আসবে, তার মুখেই সব শুনতে পাবে।

আজ আর শ্যামলী কোন মন্তব্য করে না। এতকাল পরে একজন দেশের

লোক এসেছে শুনেও একটুখানি ঔৎসুক্য দেখায় না। সে নীরবে চলে যায়। যখন আবার ফিরে আসে তার চোখদুটো ভিজা। সে বলে, ভৈরব তুমি সত্যসত্যই আমার জন্য আর কোন চিন্তা কোরো না, তোমার যেখানে খুশি, যেখানে গেলে তুমি আনন্দ পাবে, সেইখানেই যখন ইচ্ছা চলে যেও। আজ আমি সরল মনেই বলছি, তুমি মনে কোরো না যে আমি তোমাকে পিছু টানছি।

সন্ন্যাসী কোন জবাব দেয় না, শুধু বোঝে যে শ্যামলী একটা স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

পরদিন অনন্ত আর আসে না, খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে সে দেশে গেছে। সঙ্গীরা যায়, সে আর থাকে কি ক'রে?

[একত্রিশ]

নয়নের হুকুমে পরদিন থেকেই শুখ ময়নার তদ্বিরে লেগে যায়। সেও তো এক বেদে কবিরাজের মেয়ে—নানা ওষুধপত্র সে তৈরী করে। স্নানাহারের নিয়ম দেয় বদলে। মনটা ময়নার যাতে অন্যমনস্ক থাকে তার জন্য নয়নও নেয় নানা কৌশলের আশ্রয়। আজ এটা শিকার ক'রে আনে, কাল হয়ত এক জোড়া বুনো মোরগ।

তুমি না রান্ধলে আমি খামুনা। ওটার গা দিয়া এখনো বাইস্থার গন্ধ পাই! ওয়াক্ থু।

শুখ চোখ বাঁকায়। সে সব জানে, তাই রাগ না হয়ে মুখ আড়াল ক'রে হাসে একটু। ময়না রাঁধতে যায়।

রান্না-বান্না খাওয়া দাওয়া হতে এক একদিন রাত হয় অনেক। নয়ন হাই

তোলে। ময়না বলে, এখন কোথায় শুতবিক? ওর গায় তো বাইত্তার গোন্ধ।

তোমার কাছে—এইখানে।

মাঝ রাতে উঠে ময়না দেখে যে নয়ন নেই।

এমনি ক'রে দিন কাটে। এখন আর ময়নার ওপর ভর করে না মা-মনসা। ময়নার শরীরটা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু মনটা তার কিছুতেই যেন ফিরতে চায় না। তাই মাঝে মাঝে ওর ভয় হয়, সে বুঝি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

[বত্রিশ]

পদ্মদীঘিতে বসন্ত এসেছে তার অনন্ত সম্ভার নিয়ে। এপারে ওপারে ফুল ফুটেছে হাজারো রকম। শিমুল পলাশ মাদার ফুলে হোলির আবির লেগেছে। আর ছায়া পড়েছে কালো জলে। কখনো স্থির, কখনো টলমল করছে রাঙা ছায়া—এ যেন স্বপ্নলোকের এক মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে কোন্ শিল্পী। হারগুজি ও নলখাগড়ার বনে ছোট ছোট বাবুই এবং বউ-কথা-কও পাখি উড়ে উড়ে বসছে! তাল তমালের গায় শ্লথ হয়ে ঝুলে পড়েছে বুনো ফুলের লতা। নানা রকমারি মাছ ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটছে—আবার জল ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে অগাধ জলের নিচে। তাদের পাখনার রঙেও যেন বসন্তের রঙ লেগেছে। একটা ডাহুক সোহাগ করছে ডাহুকীকে।

এই পদ্মদীঘির পুব পার দিয়ে কুয়াশা ঠেলে এই সেদিনও সূর্য উঠেছে একটা রঙিন মাখনের দলার মতো। চাঁদ অস্ত গেছে একটা রূপোর থালার মতো। সবই সেদিনের কথা, কিন্তু অনেক দিন হয় ময়না এসব দিকে নজর

দেয় না—আর দেবে কি, সে যেন ভুলেই গেছে এসব। আজ আবার হঠাৎ চোখে পড়ে পদ্মদীঘিতে বসন্তের আগমন। বুনো মন বনের জংলা জলাশয়ের সৌন্দর্যে রিমঝিম ক'রে ওঠে।

গতকাল সে ভৈরবের সংবাদ পেয়েছে। সংবাদ পেয়েই তার মৃত যৌবন যেন অমৃতে স্নান ক'রে উঠেছে। ভ্রমর যেন গুঞ্জন ক'রে ফিরছে তার মনের পদ্মবনে। ময়নার রক্তে যেন মহুয়ার মদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনন্ত ঘরামী এসে ব'লে গেছে, সাধু নাকি তার শ্রীবৃন্দাবনে। শ্যামলীও নাকি সঙ্গে আছে। অনন্ত তীর্থে গিয়েছিল, সব দেখে এসেছে।

-বলিস কি ঘরামীর পো। হামিও শ্রীবৃন্দাবন যাবেক। নয়ন ঝটপট্ সাজ কর।

এখন যাবা ক্যাম্‌নে? কাইল দশটায় জাহাজ? তারপর রেল। আমি তো পথ চিনি না!

অনন্ত ঘরামী জলের মতো পথের নিশানা ব'লে দেয়। এখান থিকা জাহাজ, জাহাজ থিকা রেল। রেল থিকা শিয়ালদা, শিয়ালদা থিকা হাওড়া। হাওড়া থিকা শ্রীবৃন্দাবন। এ আর কঠিন কি! দেখতে দেখতে চইলা যাও।

নয়ন বলে, কিন্তু যদি হারাইয়া যাই?

গ্যালেই হইল! পুলিশে গুতাইয়া বাহির করবে। ময়নাদিদির মতো সোমত্ত মাইয়া লোক লইয়া হারাইলেই হইল!

তয় আমি যামু না।

ময়নাদিদির যখন তীর্থ করার ইচ্ছা হইছে, তখন তোরে ঘাড়ে ধইরা লইয়া যাইবে। তুই বড় সেয়ান হইছ।

মোট কথা শেষে স্থির হয়, ওরা জিজ্ঞাসা করতে করতেই যাবে? ময়নার মনটাও সাপের কাটা ফণার মতো লাফায়। ইচ্ছা হয় শ্যামলীকে এই মুহূর্তে গিয়ে দংশন করতে।

সকাল বেলাই ময়না বাসা পাহারার লোক স্থির করে। শুখকে উপদেশ দেয় যথোপযুক্ত—তোর কি ভয় করবেক বহিন?

মুখ পাথরের মতো দৃঢ়তা দেখায় কারণ তার শরীরেও তো রয়েছে বেদের রক্ত।

কিন্তু নয়নের দিকে চাওয়া মাত্র তার চোখ আবডালে নিতে হয়। মদের পাত্রটা সন্থ সে হাতে পেয়েছে—এখনো ভাল ক'রে আস্বাদ নেওয়া হয়নি। যুবতীর কাছে এ মদের লোভানী যে কি তা ব্যক্ত করা সুকঠিন।

রওনা দেওয়ার সময় ময়না সু-ধার টাংগিখানা টেনে নেয়।

ও কি? যাও তীথে, সাধু সঙ্গে, মানুষে কইবে কি?

হাতিয়ার ছেড়ে হামরা এক পাও যাবেকনি। নিষেধ আছেক গুরুর। তুই আগ্‌বাড়্হা।

নয়ন এগিয়ে চলে। ময়না অস্ত্রখানার ধার পরীক্ষা ক'রে দেখে।

তুমি একটা কিছু ঘটাইবা!

বেদেনী একটা খল রহস্যময় হাসি হাসে।

ওরা দু'দিন বাদে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে পৌছায়। প্রশ্ন করতে করতে যারা তাতারের মরুভূমি মালভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছে তাদের কাছে শ্রীবৃন্দাবন আর কি! ভৈরবের ঠিকানাও বার করা কঠিন নয়।

ওরা পাণ্ডার সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে এক পাথর বাঁধান পথে ঢোকে। জিজ্ঞাসা করতে করতে একটা ছোট্ট বাড়ির সুমুখে এসে থামে। একজন বাঙালী ভদ্রলোক নয়ন ও বেদেনীকে দেখে দাঁড়ায়। কাকে চাই?

বেদেনী কম্পিত কণ্ঠে বলে, ভৈরব গোঁসাইকে।

তুমি বুঝি বেদের মেয়ে?

ময়না বলে, হুঁ।

ভদ্রলোক বলে, অনেক দিন দেশ ছাড়লে কি হয়, দেখ আমি ঠিক চিনেছি। পূর্ব-বাঙলার বেদেদের ধরণ-ধারণ আলাদা। চোখ মুখের সজল ভাব কি মোছা যায়? ভৈরবও তো পূর্ব-বাঙলার মানুষ। তা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো বুঝি। কিন্তু সে তো এখানে নেই।

কি বলছিস্?—ময়নার গলা শুকিয়ে যায়। মাথাটা চরকির মতো ঘুরতে থাকে। কত কি যে সে ভেবে এসেছে! যেন তাসের ঘরের মতো সব উলটে যায়।

কোথায় গেছেক হামাদের গোঁসাই?

ঠিক বলতে পারছিনে। তোমরা একটু এগিয়ে ঐ বাড়িটার কড়া নাড়ো। দেখবে একটি অল্প বয়সী মেয়ে বেরিয়ে আসবে, তাকে সব জিজ্ঞাসা কোরো। তার কাছেই সব জানতে পারবে। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে—ডাক্তারখানায় যাবো, নইলে তোমাদের সঙ্গে যেতাম। সুমুখের ঐ বাড়িটা। তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না চিনতে।—ভদ্রলোক বাড়িটা দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে এক চমকা ময়নার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যায়।

সারা পথে যতখানি উত্তেজনা বোধ করেনি ময়না এটুকু পথ যেতে তাই বোধ করে। কিন্তু টাংগির বাটটা ধরে শক্ত হাতে।

কড়া নাড়তেই বেরিয়ে আসে শ্যামলী। সাপে নেউলে যেন মুখোমুখি হয়। দু'জনে দু'জনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। শ্যামলী কল্পনা করতে পারেনি যে ময়না এখানে আসবে। আর ময়না কল্পনা করতে পারেনি যে শ্যামলীর এত চেহারার পরিবর্তন ঘটবে। কোথায় সে চটুলা নারী? এ যে বিষাদের প্রতিমা একখানি। চোখে মুখে ছাপ পড়েছে তাড়নার। এ রোগে ময়নাও ভুগে উঠেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় তারই মর্মান্তিক ছায়া পড়েছে শ্যামলীর সারা দেহে।

ময়নার হাতের টাংগি শ্লথ হয়ে আসে।

শুকনা গলায় সে জিজ্ঞাসা করে, গোঁসাই কোথায় আছে বহিন?

নানা ছল ক'রে বহু তীর্থ পর্যটন ক'রে বেড়িয়েছে শ্যামলী ভৈরবকে নিয়ে। এখনও ধ্রুবর সন্ধান মেলেনি। সে সন্ধান আর পাওয়া যাবে না তাও জেনে ফেলেছে ভৈরব। তাই সে শক্ত হয়ে তাঁবু ফেলেছিল

শ্রীবৃন্দাবনে। ঘুরুক, খুঁজুক শ্যামলী এই মহাতীর্থে তার অন্তরের কাম্যকে। হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে, হয়ত রেহাই দিতে পারে তাকে। হয়ত নয়—নিশ্চয় হবে দেখা, নিশ্চয় পূর্ণ হবে তার মনস্কাম। 'মরা মরা' জপ করতে করতেই তো একদিন তস্কর পেয়েছিলো নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে। তবে শ্যামলই বা পাবে না কেন? বহুস্থানে নয়, এইখানেই আছে শ্যামলীর বাঞ্ছিত ধ্রুব।

এখন আর বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছিল না ভৈরবের। সে তো এই চায়। সংসার বিরাগী বৈরাগীর এর চেয়ে আর শান্তির কি আছে? নিত্য দর্শন করছে তার রাধামাধবকে। নিত্য অঙ্গে মাখছে শ্রীবৃন্দাবনের রাঙা ধূলি, নিত্য দেখছে লীলাময়ের অনন্ত লীলাভূমি। যুগযুগান্ত বসে এসব দেখলেও বোধ হয় রসহীন হবে না ভৈরবের কাছে। দেশেও সে ভিক্ষা করত, এখানেও সে ভিক্ষা করে, দিন চলে যায় ধীরে ধীরে।

ইতিপূর্বে মুখে কিছু না বললেও বহু অসংযমের পরিচয় দিয়েছে শ্যামলী। অনেক লালসা ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তার হাবভাব কটাক্ষে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি ভৈরব। শুধু ওর সঙ্গে উধাও ধেয়ে চলেছে। ওকে বিশ্রাম দেয়নি। স্থির হ'তে দেয়নি—কোথায় তোমার ধ্রুব, কোথায় সে নবীন সন্ন্যাসী, সেইদিকে চলো। দিন নেই, রাত নেই—শুধু ছুটে বেড়িয়েছে ওর সঙ্গে।

নয়ন ও ময়নাকে বসতে দিয়ে শ্যামলী বলে, সাধু তো এখানে নেই। মিছে-মিছিই তুমি আলেয়ার পিছে ছুটে এসেছো বেদে বোন।

কোথায় আছেক গোঁসাই?

দেশে গেছে।

সত্যি?

জানিনে। তবে বলে গেছে যে তোমাকে দেখতে যাচ্ছে।

হামাকে? না, না, মিছা বাত্, আর বলিসনি বহিন। বহুৎ মেহনৎ

করে হামি এসেছি এইখানে। এই তিন দিন দানা মুখে দেই নি—ময়নার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আর হাতের কম্পিত টাংগিখানা নয়ন ধরে।

বিশ্রাম কর খেয়ে দেয়ে কাল যাবে। ভৈরব তোমারও নয়, কারুরই নয়। ও আগুন শুধু পোড়াতেই জানে।

ময়না মাথা নাড়ায়। সে কিছুতেই দাঁড়াবে না। এক্ষুণি হামি যাবেক।

যাও, কিন্তু গিয়ে লাভ হবে না। ও সাধু নয়—শুধু আগুন।

ময়না বেরিয়ে আসে নয়নকে নিয়ে।

তখন দ্বিপ্রহরের রোদ যেন তৃষ্ণায় কাঁদছে।

[তেত্রিশ]

পদ্মদীঘিতে ফিরে এসে ময়না দেখে যে সাধু এসে পৌঁছায়নি। তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে শুখকে জিজ্ঞাসা করে। শুখ সলজ্জ হাসি হেসে বলে যে এমন লক্ষণযুক্ত সুপুরুষ কেউ এখানে আসেনি। এসেছিল গালে অর্বুতয়ালা এক চাষী। নাম জাবেদালী। সে একটা মরা তালগাছ কিনতে চায়। ময়না বিরক্ত হয় শুনে।

নয়ন বলে, সাধু কি তোমার একার রক্ষিতা যে সোজা তমালতলা আইবে? ওর কথা তুমি ভুইলা যাও বুইনদিদি। ওরা কেউরে ভালবাসতে জানে না। ওরা কেউর বশ মানে না। ওরা জানে ক্যাবল কান্দাইতে। উপাসের চোটে আমার চৌক্ষে জল আইছে।

দুঃখ না করলেক কি সুখ হয়রে পাগলা!

আমারে চারডি খাইতে দিয়া তুমি না হয় পা ছড়াইয়া কাঁদতে বইস—ওরে আমার গুণের গোঁসাইরে!—নয়ন গরগর ক'রে স্নান করতে যায়।

ময়নাও স্নান সেরে এসে ওকে খেতে ডাকে।

যে যাই বলুক ময়না কিন্তু তার মনের গূহ কোণ থেকে আশার দীপ নিবায় না। সে জ্বালিয়ে রাখে সযত্নে এবং সংগোপনে। সে কারুর কাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। সে শুধু প্রতীক্ষা করে।

গোটা কয়েক দিন অমনি কেটে যায়।

অবশেষে সত্যি সংবাদ আসে যে ভৈরব নাকি বংশীতলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আজই এখানে আসবে।

আজ ময়নার কানে আর কারুর কথা যায় না। এমন কি নয়নকেও সে যেন দেখতে পায় না। বুনো মনে জংলা ভাব জেগেছে। সে ভোর না হ'তেই জলে নেমে সাঁতার কেটে স্নান করে। ঢেউ গড়িয়ে যায় পদ্মপাতার ওপর দিয়ে। কতদিন পরে গেরুয়া শাড়ি আবার সে কুঁচি দিয়ে পরে। একটু লজ্জা করে বটে, একটু ভয়ও হয় যেন—আবার ধমনীতে ধমনীতে জাগে দ্রুত স্পন্দন। আজ সে অনেক দিন বাদে নিজেকে সংহত করার জন্য একান্ত ভাবে সংসারী কাজে মন বসাতে চায়। শুথকে বলে সব কিছু এগিয়ে জুগিয়ে দিতে। সে রান্না করবে ভাল ভাল জিনিস।

নয়ন একটু সকাল-সকালই খেয়ে ওঠে।

ময়না তাকে বলে কিছু ফল মূল যোগাড় করা যায় কিনা। অন্তত কয়েকটা কলা। দুধ সে খানিকটা যোগাড় করেছে।

ক্যান্?

সাধু আসছেক—তোদের ভৈরব।

তাই কও। আমি ভাবছিলাম আবার কোন্ নাগরের আলতি (আরতি) করবা, তাই দুধ কলা—তাই অমন সাজ-সজ্জা! আমার তো ভয়ই হইছিল মনে, আবার অজ্ঞান হও নাকি—আবার ভর করে নাকি দেবতা! কয়ডা দিন একটু ভাল আছ—আমি সুস্থ আছি মানুষের অত্যাচার থিকা।

নয়ন সারা বাগান খুঁজে খুব ভাল একছড়া কলা সংগ্রহ ক'রে এনে দেয়। ময়না সন্তুষ্ট হয় অত্যন্ত।

নয়ন বলে, ছাখো, আমরা কি ভাবছিলাম—আর হইল কি ! মানুষের মন দেবতারাও বোঝে না।

হামারা তো ভজন-পূজন জানিকনি—ক্যাম্‌নে বুঝবেক সাধুর মন।

নয়ন আবার বেরিয়ে যায়। ভাবে, মাছ ধরবে, কিন্তু তুলে আনে এক ডালা গন্ধরাজ ফুল। সাধুর জন্য এক জোড়া পাদুকা প্রস্তুত করে সুপারি-পাতার খোল দিয়ে। আবার সে বেরিয়ে যায় তমালতলার দিকে—সাধু এলো কিনা তার খবর নিতে।

ভারী অথির—তুই ভারী চঞ্চল আছিস রে নয়ন।

আমি তো অস্থিরই—সে কথা তো ঠিকই—তারপর সে যা টিপ্পনি কাটে তা আর শোনা যায় না। দক্ষিণা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ময়না একখানা জলচৌকি নামিয়ে আনে—জল রাখে একটা নূতন কলসী ভ'রে। জুতোজোড়া তো নিচেই নামান রয়েছে।

তারপর সে কি করবে ? নয়নের মতো তো সে আর ছুটাছুটি করতে পারে না ! সে গুনগুন করে গান ধরে, কিন্তু গানও ফুরিয়ে যায়। এখন কি ক'রে কাটবে এতটা বেলা ? এখনও তো সন্ধ্যা হ'তে ঢের দেরি···সাধু হয়ত সন্ধ্যা নাগাত আসবে।

এমনি সময় নয়ন ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। সে একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে। সাধুর সংবাদ নয়—সাপের। বুনো গোখ্‌রার।

কুমোরেরা এখন আর পাতিল গড়ায় না—তাদের বাড়ির পাশের ছুতরেরাও আর হুকোর নৈচা তৈয়ারী করে না। ওরা সবাই এখন মজুর খাটে। দু'জনের সীমানার দু'পাশে হাঁড়ি ও নৈচার টাল মজুত থাকত সর্বদা। এখন সেখানে কিছুই নেই। জমেছে আঁস্তাকুড় আর জঞ্জাল। তার ভিতর একটা গোখ্‌রা সাপ ফোঁস ফোঁস করছে।

আজ এই সাপটা ধ'রে নয়নকে শেখাতে হবে হাতসাফাই। ময়না কিছুতেই

এড়াতে পারবে না—এ সুযোগ আর আসবে না। নয়ন একরকম ময়নার হাত ধ'রেই টানাটানি আরম্ভ করে।

ময়নার আর এড়াবার উপায় নেই। অগত্যা সে গেরুয়া শাড়ি ছেড়ে একখানা ধূসররঙের শাড়ি পরে। চোখের পাতায় রক্তচন্দনের একটা গাঢ় প্রলেপ দেয়। কিছু বনজ ওষুধ-পত্তর নয়নের হাতে দিয়ে বলে, যদি তাকে সাপে ঘা দেয় তবে নয়ন যেন আর দেরি না ক'রে ঐ শিকড় ও পাথর লাগিয়ে দেয় ক্ষতস্থানে। আগে 'ধন্নি' বাঁধতে হবে ক্ষতস্থানের কতটা ওপরে তাই শিখিয়ে দেয়। বুনো সাপ দুশমন আছেক, খুব হুসিয়ার লয়ন। হামার জান তোর ঠাঁই।

একবার ভয় হয় নয়নের, আবার উগ্র ঔৎসুক্যে মন ভ'রে ওঠে। সে বলে, চলো এখন।

দাঁড়া একটুক।

ময়না মনসাকে বন্দনা ক'রে ওখান থেকে দু মুঠি অত্যন্ত মিহি ধুলো তুলে নেয়। তারপর সে কুমোর-পাড়ার দিকে চলতে থাকে। তার চোখের ভাব দেখে ছেলেমেয়েরা সব সরে যায়।

কাল্‌হইয়া বিষ কাজ্‌লা বরণ
হামি গাড়ুড়ি মনসা-চরণ
পদ্মার আজ্ঞায় ধরবেক তোরে
খাড়া কাল্‌হইয়া, যাবি কোন্ দুয়ারে ?
চক্ষু তোর কাইজের লাখান
শোনো নাই হামার বাখান—
হামি, গোখ্‌খুর তোর যম
শিব মহাদেও ববম্ বম্।...

ময়না গাল বাজিয়ে এগিয়ে চলে।

কোথা আছেক ?

ঐ যে। নয়ন দেখিয়ে দিয়ে সরে যায়।

হিলবিল করছে জিভ—মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ক্রূর চোখে। কতকগুলো আবর্জনা পা দিয়ে ঠেলে ফেলে ময়না। কালগোখ্‌রাই বটে!

অনেক লোক জমে গেছে চারদিকে, কিন্তু সবাই বেশ দূরে দূরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। অনেকেই সাপের খেলা দেখেছে, কিন্তু কেউ জ্যান্ত সাপ ধরতে দেখেনি আজ পর্যন্ত।

জঞ্জালের গাদায় নাড়া পড়তেই কি ভেবে যেন সাপটা কুমোর-বাড়ির উঠানের দিকে নামে। অমনি ময়না কি সব জংলা বুলি আওড়াতে আওড়াতে বিদ্যুতের মতো তার সুমুখে গিয়ে পড়ে। বাঁ হাতে ছুড়ে মারে ধূলা। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো দেখা যায়। তড়াক ক'রে লেজে ভর ক'রে গর্জে ওঠে সাপটা। আবার ডান হাতের ধুলো—ঠিক চোখজোড়া লক্ষ্য করে ছোঁড়ে ময়না। ছোবল মারবে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তার আগেই ময়না একহাতে সাঁড়াশির মত চেপে ধরে গলা, অন্যহাতে একটানে শিথিল করে দেয় তার সমস্ত শরীরের অস্থিপঞ্জর। ঠিক দড়ার মত টেনে ঢিলে করে দিয়েছে তার হাড়ের বাঁধন। এমনি করে না টানলে সাপটা তার লেজের প্যাঁচে ভেঙে ফেলে দিত ময়নার হাতের হাড়।

কয়েক মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু সবাই যেন দুঃস্বপ্ন দেখে ওঠে।

ময়না আর দাঁড়ায় না—দ্রুতপদে বাজপক্ষিনীর মত পদ্মদীঘির দিকে চলে যায়। এখনি বিষ দাঁত ভেঙে ওকে মেটে-হাঁড়িতে আটকাতে হবে। তারপর সাত দিন অনাহার।

নয়ন বোঝে, এ ভয়ঙ্কর হাতসাফাই!

সেদিন আর সন্ন্যাসী আসে না।

পরের দিন আবার সূর্য উঠেছে—তার বর্ণালী ছড়িয়ে গেছে পদ্মদীঘির চারপারে। ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় আবার সেই ক্ষ্যাপা ফাগুনের আগুন

জ্বলছে। আজও জংলি ময়না সেজেছে। ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে এনেছে নয়ন। কি যেন ফুলের কুঁড়ি দিয়ে একটা ছোট্ট একনরী হার গেঁথে খোঁপায় পড়েছে ময়না। দাক্ষিণা বাতাসে ভেসে আসছে তার সুগন্ধ। এ তো খোঁপার ফুলের সৌরভ নয়, যেন কস্তুরী-সুবাস—উগ্র হুতাশন! নিজের গন্ধে নিজেই ময়না বুঝি পাগল হবে আজ।

সারাদিন অপেক্ষা ক'রে নয়ন কোথায় যেন হরিসংকীর্তনে চলে যায়। তার আর ভাল লাগছে না। আজো হয়ত সাধু আসবে না।

ময়না সবে সন্ধ্যা দীপ জ্বেলেছে এমন সময় অতিথি আসে—আসে বহু কামনার ভৈরব।

কম্পিত হস্তে সাধুকে পাদ্য-অর্ঘ দেয় ময়না। মুখে কিছু বলতে পারে না। কতদূর থেকে কেমন ক'রে কিভাবে সে এসেছে—একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে জিভ নড়ে না। এত প্রগলভতা কোথায় যে যায় তার!

সাধু পা ধুতে ধুতে বলে, আর পা ধুয়ে কি হবে, পায় কি কিছু আছে? জায়গায় জায়গায় ফেটে রক্তমুখো হয়ে গেছে। তোমরা কেমন আছো? নয়নটা? সাধুকে প্রদীপ দেখিয়ে বাসায় নিয়ে যায় ময়না—একটু পায়ের ধুলো পর্যন্ত নিতে সে ভুলে যায়।

ময়না আজ তার বাসাখানা সমস্ত ধুয়েছে, এতটুকু এঁটো-কাঁটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সব তকতক ঝকঝক করছে। কেমন গোছগাছ দেখাচ্ছে ঢাল-সড়কি ল্যাজা, এমন কি টাংগিটাও। মাছ ধরবার জাল, ঘুঘু ধরার ফাঁদ, কোঁচ, গাইতি বঁড়শি—যত সব জঞ্জাল উঠেছে মাচার ওপর।

ঘরে একখানাই শয্যা পাতা—সেই মোটা মাদুরের শয্যা, তা শুধু সন্ন্যাসীর বিশ্রামের জন্য।

ময়না এনে সাজিয়ে দেয় দুধ-কলা পদ্মপাতার ঠোঙায় এবং পাতায়। সুমুখে পেতে দিয়েছে একখানা আসন। সেখানাও কতকগুলো পদ্মপাতা থাকে থাকে বাবলার আঠা দিয়ে জুড়ে পদ্মফুলের মত নক্সি ক'রে কেটে তৈরী করা হয়েছে।

ময়নারই হাতের তৈরী—একান্ত সাধুর জন্যই আজ সকালবেলা এখানা সে বানিয়েছে।

এসব কি ময়না?

এবার কম্পিত কণ্ঠে ময়না জবাব দেয়, হামার ভূঁখা সাধুর ভিখ আছেক।

ভৈরব স্মিতমুখে বলে, তোমার সাধু তো এখন আর ভূঁখা নয়—সে অনেক দেখেছে।

কি দেখেছেক হামার? হামি অচ্ছুৎ মেয়ে আছিক?

না ময়না। আমি বৈরাগী—আমার জাতিধর্মের বিচার নেই। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। পরম তৃপ্তিসহকারে ভৈরব খেতে আরম্ভ করে। তোমরা কেমন আছো তা তো বললে না?

ভাল আছেক তোর লয়ন।

আর তুমি?

এতদিন পরে কুশলপ্রশ্ন! একটা রুদ্ধ অভিমান বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চায় ময়নার। সে এঁটো পাতা নিয়ে উঠে যায়। আবার একটু পরেই ফিরে আসে।

ভৈরব বিছানায় এসে বসে। কি, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে—বসো! ময়নার হাতখানা ধ'রে সে তাকে কাছে বসায়। তুমি বড় অভিমানিনী ময়না।

আর তুই? তোর কলিজা বড় কাদার লাখান নরম—নারে সাধু?

ভৈরব হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

ময়নার একটু রাগ হয়। সে চুপ করে শয্যার একটি পাশে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। প্রদীপটা স্থির শিখা বিস্তার ক'রে জ্বলছে। বাইরে ফাগুনের রাত্রি গড়িয়ে যাচ্ছে। অজস্র তারার আলো পড়েছে দীঘির কালো বুকে। একটা কোকিল ডাকে। শিয়ালের দল করে প্রহর-ঘোষণা। চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে চারদিক।

ময়না আর এসব সইতে পারবে না। তার চৈতন্য আবার লুপ্ত হবে—আবার সে সংজ্ঞাহীনা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ভৈরব কেন এলো এখানে? জগতে সকলই তো অসার, তবে সে এখানে কি চায়?

কি চেয়েছিল শ্যামলী সাধুর কাছে? কেন পালিয়ে গিয়েছিল সে?

এবার ভৈরব নিতান্ত গৃহীর মতো ব্যবহার করে। সে তার থলে থেকে একখানা কাঠের কাঁকই ও রুদ্রাক্ষের মালা একছড়া বার ক'রে ময়নার হাতে দেয়। এই নাও, তোমার জন্য এনেছি।

ময়না ওগুলি নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকে।

তোমার চুলগুলো বড়, সামলাতে পারো না তাই ঐ কাঁকইখানা এনেছি। মালার কথা তুমিই না একদিন আমাকে বলেছিলে! সত্যই ময়না, বসনের সঙ্গে বেশেরও প্রয়োজন আছে।…এ কি? তুমি যে কথা বলছো না? ভৈরব ময়নার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাতে থাকে। বড্ড রাগ করেছো, না?

ময়না আবার বল্গাহীনা কস্তুরীমৃগীর মতো অধীর হয়ে পড়ে। তার দেহে ভৈরবের ও-স্পর্শ—স্পর্শ তো নয় যেন বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত বাসনা মহাকালের কাছে ধ্বংস কামনা করে। সে হঠাৎ ভৈরবের কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলে, তুই বসন দিলি বেশ দিলি—এখন একটি জিনিস ভিখ দে ভগওয়ান।

একটু বিরক্ত ও আশ্চর্য হয়ে ভৈরব জবাব দেয়, তুমি গলা ছাড়ো। কি চাও তাই বলো।

ময়নার কানে যেন সে কথা প্রবেশ করে না। সে এতদিন ভয়ে ভৈরবকে ভজন করেছে কিন্তু আজ একান্ত নির্ভয়ে, নিতান্ত অকুণ্ঠচিত্তে তার কাছে শুধু একটি কামনা ভিক্ষা করে, হামি মা আছি, মেলানি মাংগি, তুই একটি ছাওয়াল দে পাষাণ!

ক্ষণিকের জন্য নির্বাক হয়ে থাকে ভৈরব। তারপর দৃঢ় হস্তে ময়নার বাহুবেষ্টনী খুলে ফেলে। সে আর চাইতে পারে না বুনো বাঘিনীর দৃষ্টির দিকে।

মহুয়া হামাকে অপমান করলেক, শ্যামলী কেড়ে নিলে তোকে—তুই ফির বিদেশে যাবি—হামি মরবেক, তুই হামাকে একটি ছেলে দে গোঁসাই! ময়নার কণ্ঠে গভীর আকুতি ফুটে ওঠে।

তুমি পাগল হয়েছো ময়না। নিজেকে সামলাও।

কি হামি পাগলা—'আর সব সেয়ান? বুনো বেদেনী বাড়বাগ্নির মতো জলে ওঠে। তার খোঁপা খুলে গেছে, ফুলের মালা ঘরের পাটাতনে লুটিয়ে পড়েছে। সব সেয়ান—আর হামি অজ্ঞেয়ান—ভাগ্ তোর বিচার লিয়ে। এখন তার বুকের আঁচলও খুলে পড়ে বিশৃঙ্খল হয়ে। ময়না সরোষে ভৈরবকে একটা লাথি মারে। মিঠা-জামির!

ভৈরব নীরবে একতারাটা হাতে নিয়ে বসন্তের উত্তপ্ত রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে আবার হাস্যমুখে পাড়ি জমায়।

ময়না নিজের মৃত্যুকামনা করে সাধুর শূন্য শয্যায় লুটিয়ে পড়ে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই জানতে পারে যে ময়না যেন কোথায় চলে গেছে। দীঘির স্বপ্ন, জমিদার-বাড়ির বিস্ময় তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

চঞ্চলা যাযাবরী যাত্রা করেছে কোন্ যেন এক অজানা-অনামা নিরুদ্দেশে।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ এই লেখকের অন্যান্য রচনা ॥

দক্ষিণের বিল (১ম ও ২য় খণ্ড)
চরকাশেম
ভাঙছে শুধু ভাঙছে
বেআইনি জনতা
অহল্যা কন্যা
একটি সংগীতের জন্ম কাহিনী
কনকপুরের কবি
জোটের মহল
মন্থন
কুসুমের স্মৃতি
একটি স্মরণীয় রাত্রি
এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (নাটিকা…যন্ত্রস্থ)